BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

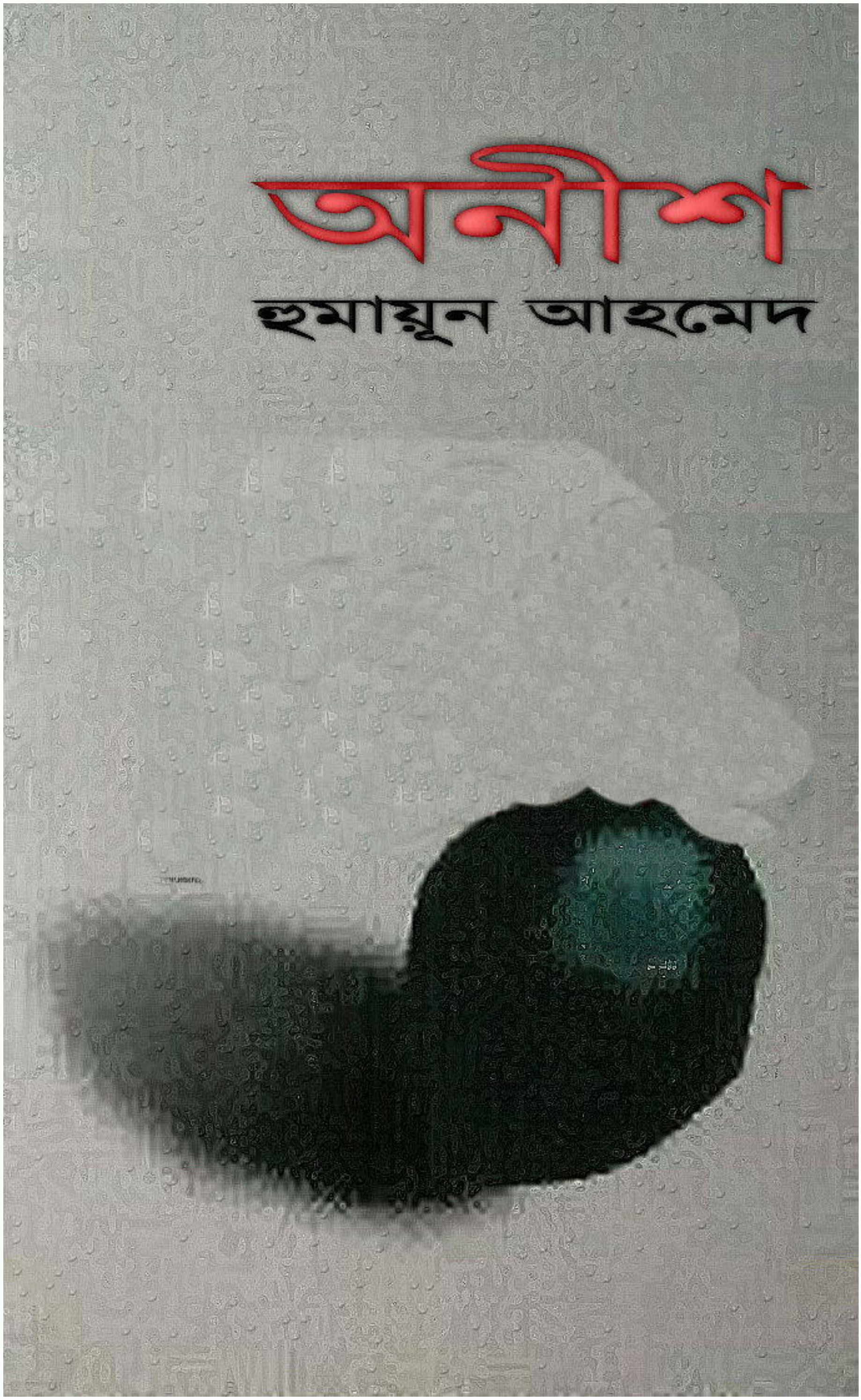
অনীশ
হুমায়ূন আহমেদ

# ১ অনীশ

হাসপাতালের কেবিন ধরাধরি ছাড়া পাওয়া যায় না, এই প্রচলিত ধারণা সম্ভবত পুরোপুরি সত্যি নয়। মিসির আলি পেয়েছেন, ধরাধরি ছাড়াই পেয়েছেন। অবশ্যি জেনারেল ওয়ার্ডে থাকার সময় একজন ডাক্তারকে বিনীতভাবে বলেছিলেন, 'ভাই একটু দেখবেন—একটা কেবিন পেলে বড় ভালো হয়।' এই সামান্য কথাতেই কাজ হবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আজকাল কথাতে কিছু হয় না। যে-ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি বুড়ো। মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হয় সমগ্র মানবজাতির ওপরই তিনি বিরক্ত। কোনো ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মানবজাতি নিঃশেষ হয়ে আবার যদি এককোষী এ্যামিবা থেকে জীবনের শুরু করে তাহলে তিনি খানিকটা আরাম পান। তাঁকে দেখে মনে হয় নি তিনি মিসির আলির অনুরোধ মনে রাখবেন। কিন্তু ভদ্রলোক মনে রেখেছেন। কেবিন জোগাড় হয়েছে পাঁচতলায়। রুম নাম্বার চার শ' নয়।

সব জায়গায় বাংলা প্রচলন হলেও হাসপাতালের সাইনবোর্ডগুলি এখনো বদলায় নি। ওয়ার্ড, কেবিন, পেডিয়াট্রিকস—এ-সব ইংরেজিতেই লেখা। শুধু রোমান হরফের জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা হরফ। হয়তো এগুলির সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নি। কেবিনের বাংলা কী হবে? কুটির? জেনারেল ওয়ার্ডের বাংলা কি 'সাধারণ কক্ষ'?

যতটা উৎসাহ নিয়ে মিসির আলি চার শ' ন' নম্বর কেবিনে এলেন ততটা উৎসাহ থাকল না। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন—বাথরুমের ট্যাপ বন্ধ হয় না। যত কষেই প্যাঁচ আটকানো যাক, ক্ষীণ জলধারা ঝরনার মতো পড়তেই থাকে। কমোডের ফ্ল্যাশও কাজ করে না। ফ্ল্যাশ টানলে ঘড়ঘড় শব্দ হয় এবং কমোডের পানিতে সামান্য আলোড়ন দেখা যায়। এই পর্যন্তই। তার চেয়েও ভয়াবহ আবিষ্কারটা করলেন রাতে ঘুমোতে যাবার সময়। দেখলেন বেডের পাশে সাদা দেয়ালে সবুজ রঙের মার্কার দিয়ে লেখা—

"এই ঘরে যে থাকবে
সে মারা যাবে।
ইহা সত্য। মিথ্যা নয়।।"

মিসির আলির চরিত্র এমন নয় যে এই লেখা দেখে তিনি আঁতকে উঠবেন এবং জেনারেল ওয়ার্ডে ফেরত যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তবে বড় রকমের অসুখ-বিসুখের সময় মানুষের মন দুর্বল থাকে। মিসির আলির মনে হল তিনি মারাই যাবেন। সবুজ রঙের এই ছেলেমানুষি লেখার কারণে নয়, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে। তার 'লিভার' কাজ করছে না বললেই হয়। মনে হচ্ছে লিভারটির আর কাজ করার ইচ্ছাও নেই। শরীরের একটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলিও তাকে অনুসরণ করে। একে বলে সিমপ্যাথেটিক রিঅ্যাকশন। কারও একটা চোখ নসত হলে অন্য চোখের দৃষ্টি কমতে থাকে। তাঁর নিজের বেলাতেও মনে হচ্ছে তা-ই হচ্ছে। লিভারের শোকে শরীরের অন্যসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গও কাতর। একসময় ফট করে কাজ বন্ধ করে দেবে। হৃদপিণ্ড বলবে – কী দরকার গ্যালন গ্যালন রক্ত পাম্প করে? অনেক তো করলাম। শুরু হবে অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা। সেই যাত্রা কেমন হবে তিনি জানেন না। কেউই জানে না। প্রাণের জন্ম-রহস্য যেমন অজানা, প্রাণের বিনাশ-রহস্যও তেমনি অজানা।

তিনি শুয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। বেল টিপে নার্সকে ডাকলেই সে কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবে। মিসির আলির ধারণা এরা ঘুমের ট্যাবলেট অ্যাপ্রনের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রোগীর সামান্য কাতরানির শব্দ কানে যাবামাত্র ঘুমের ট্যাবলেট গিলিয়ে দেয়। কাজেই ওদের না ডেকে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল। শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পরের জগৎ নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।

ধরা যাক মৃত্যুর পরে একটি জগৎ আছে। পার্টিকেলের যদি অ্যান্টি-পার্টিকেল থাকতে পারে, ইউনিভার্সের যদি অ্যান্টি- ইউনিভার্স হয় তা হলে শরীরে অ্যান্টি-শরীর থাকতে সমস্যা কী? যদি মৃত্যুর পর কোনো জগৎ থাকে কী হবে সেই জগতের নিয়ম কানুন? এ-জগতের প্রাকৃতিক নিয়নকানুন কি সেই জগতেও সত্যি? এখানে আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, সেখানেও কি তা-ই? নিউটনের গতিসূত্র কি সেই জগতের জন্যেও সত্যি? হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল? একই সময়ে বস্তুর গতি এবং অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। পরকালেও কি তা-ই? নাকি সেখানে এটি খুবই সম্ভব?

মিসির আলি কলিংবেলের সুইচ টিপলেন। প্রচণ্ড বমি-ভাব হচ্ছে। বমি করে বিছানা ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছেন না, আবার একা একা বাথরুম পর্যন্ত যাবার সাহসও পাচ্ছেন না।মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে বাথরুমের দরজায় পড়ে যাবেন।

অল্পবয়েসি একজন নার্স ঢুকল। তাঁর গায়ের রঙ কালো, মুখে বসন্তের দাগ, তাঁর পরও চেহারায় কোথায় যেন একধরনের স্নিগ্ধতা লুকিয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, 'এত রাতে আপনাকে ডাকার জন্য আমি খুব লজ্জিত। আপনি কি আমাকে বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে যাবেন? আমি বমি করবো।'

'বাথরুমে যেতে হবে না। বিছানায় বসে বসেই বমি করুন – আপনার খাটের নিচে গামলা আছে।'

সিস্টার মিসির আলিকে ধরে ধরে বসালেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, বমি-ভাব সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল। মিসির আলি বললেন, 'সিস্টার, আপনার নাম জানতে পারি?'

'আমার নাম সুস্মিতা। আপনি কি এখন একটু ভাল বোধ করছেন?'

'বমি গলা পর্যন্ত এসে থেমে আছে। এটাকে যদি ভালো বলেন তাহলে ভালো।'

'আপনার কি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'খুব বেশি?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি।'

'আপনি শুয়ে থাকুন। আমি রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানকে ডেকে নিয়ে আসছি। তিনি হয়তো আপনাকে ঘুমের কোনো অষুধ দেবেন। তা ছাড়া আপনার গা বেশ গরম। মনে হচ্ছে টেম্পারেচার দুই-এর উপরে।'

সুস্মিতা জ্বর দেখল। এক শ' দুই পয়েন্ট পাঁচ। সে ঘরের বাতি নিভিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে গেল।

মিসির আলি লক্ষ করছেন, তাঁর মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। ঘর অন্ধকার, তবু চোখ বন্ধ করলেই হলুদ আলো দেখা যায়। চোখের রেটিনা সম্ভবত কোনো কারণে উত্তেজিত। ব্যথার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি? আচ্ছা—জ্বর মাপার যন্ত্র আছে থার্মোমিটার। ব্যথা মাপার যন্ত্র এখনো বের হল না কেন? মানুষের ব্যথা-বোধের মূল কেন্দ্র—মস্তিষ্ক। স্নায়ু ব্যথার খবর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। যে-ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ব্যথার পরিমাপক, সেই সিগন্যাল মাপা কি অসম্ভব?

ব্যথা মাপার একটা যন্ত্র থাকলে ভালো হত। প্রসববেদনার তীব্রতা নাকি সবচেয়ে বেশি। তার পরেই থার্ড ডিগ্রী বার্ন। তবে ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতাও একেক মানুষের একেক রকম। কেউ-কেউ অতি তীব্র ব্যথাও শান্তমুখে সহ্য করতে পারে। মিসির আলি পারেন না। তাঁর ইচ্ছা করছে দেয়ালে মাথা ঠুকতে। ব্যথা ভোলবার জন্যে কী করা যায়? মস্তিষ্ককে কি কোনো জটিল প্রক্রিয়ায় ফেলে দেওয়া যায় না? উল্টো করে নিজের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? কিংবা একই বাক্য চক্রাকারে বলা যায় না?

শিবে বথু কি থাব্য?

শিবে বথু কি থাব্য?

শিবে বথু কি থাব্য?

নার্স ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বাতি জ্বালাল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার?'

মিসির আলি বললেন, 'আমার ডেলিরিয়াম হচ্ছে। একটি বাক্য বারবার উল্টো করে বলছি। ''ব্যথা কি খুব বেশি''—এই বাক্যটিকে আমি উল্টো করে বলছি, 'শিবে বথু কি থাব্য?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কোনো রুগীর যখন ডেলিরিয়াম হয়, সে বুঝতে পারে না যে ডেলিরিয়াম হচ্ছে।'

'আমি বুঝতে পারি। কারণ আমার কাজই হচ্ছে মানুষের মনোজগৎ নিয়ে। ডাক্তার সাহেব, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। সম্ভব হলে খানিকটা অক্সিজেন দেবারও ব্যবস্থা করুন। আমার মস্তিষ্কে অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন হচ্ছে। আমার হেলুসিনেশন হচ্ছে।'

'কি হেলুসিনেশন?'

'আমি দেখছি আমার হাত দুটো অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এখনো লম্বা হচ্ছে।'

মিসির আলি গানের সুরে বলতে লাগলেন—

"স্বাল তক তহা রমাআ।
স্বাল তক তহা রমাআ।
স্বাল তক তহা রমাআ।"
ডাক্তার সাহেব নার্সকে প্যাথিড্রিন ইনজেকশান দিতে বললেন।

মিসির আলির ঘুম ভাঙল সকাল ন'টার দিকে।

ট্রে-তে করে হাসপাতালের নাশতা নিয়ে এসেছে। দু' স্লাইস রুটি, একটা ডিম সেদ্ধ, একটা কলা এবং আধ গ্লাস দুধ। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটির জন্যে বেশ ভালো খাবার—স্বীকার করতেই হবে। তবু বেশির ভাগ রুগী এই খাবার খায় না। তাদের জন্যে টিফিন ক্যারিয়ারে ঘরের খাবার আসে। ফ্লাস্কে আসে দুধ।

জেনারেল ওয়ার্ডের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন। সেখানকার রুগীরা হাসপাতালের খাবার খুব আগ্রহ করে খায়। যারা খেতে পারে না, তারা জমা করে রাখে। বিকেলে তাদের আত্মীয়স্বজনরা আসে। মাথা নিচু করে লজ্জিত মুখে এই খাবারগুলি তারা খেয়ে ফেলে। সামান্য খাবার, অথচ কী আগ্রহ করেই-না খায়! বড়ো মায়া লাগে মিসির আলির। কতবার নিজের খাবার ওদের দিয়ে দিয়েছেন। ওরা কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়েছে।

আজকের নাশতা মিসির আলি মুখে দিতে পারলেন না। পাউরুটিতে কামড় দিতেই বমি ভাব হল। এক চুমুক দুধ খেলেন। কলার খোসা ছাড়ালেন, কিন্তু মুখে দিতে পারলেন না। শরীর সত্যি-সত্যি বিদ্রোহ করেছে।

খাবার নিয়ে যে এসেছে, সে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ চোখে। রুগী খাবার খেতে পারছে না, এই দৃশ্য নিশ্চয়ই তার কাছে নতুন নয়। তবু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দুঃখিত। লোকটি স্নেহময় গলায় বলল, 'কষ্ট কইরা খান। না-খাইলে শরীরে বল পাইবেন না।'

মিসির আলি শুধুমাত্র লোকটিকে খুশি করবার জন্যে পাউরুটি দুধে ভিজিয়ে মুখে দিলেন। খেতে কেমন যেন ঘাসের মতো লাগছে।

আজ শুক্রবার।

শুক্রবারে রুটিন ভিজিটে ডাক্তাররা আসেন না। সেটাই স্বাভাবিক। তাঁদের ঘর-সংসার আছে, পুত্র-কন্যা আছে। জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী আছে। একটা দিন কি তাঁরা ছুটি নেবেন না? অবশ্যই নেবেন। মিসির আলি ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর কাছে কেউ আসবে না। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে এ্যাপ্রন গায়ে মাঝবয়েসী এক ডাক্তার এসে উপস্থিত। ডাক্তার আসার এটা সময় নয়। প্রথমত শুক্রবার, দ্বিতীয়ত দেড়টা বাজে, লাঞ্চ ব্রেক। ডিউটির ডাক্তাররাও এই সময় ক্যান্টিনে খেতে যান।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কেমন আছেন?'

মিসির আলি হেসে ফেলে বললেন, 'ভালো থাকলে কি হাসপাতালে পড়ে থাকি?'

'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ভালো আছেন। কাল রাতে খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন। প্রবল ডেলিরিয়াম।'

'আপনি রাতে এসেছিলেন?'

'জ্বি।'

'চিনতে পারছি না। মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। গত রাতে কী ঘটেছে কিচ্ছু মনে নেই।'

ডাক্তার সাহেব চেয়ারে বসলেন। তাঁর শরীর বেশ ভারি। শরীরের সঙ্গে মিল রেখে গলার স্বর ভারি। চশমার কাঁচ ভারি। সবই ভারি-ভারি, তবুও মানুষটির কথা বলার মধ্যে সহজ হালকা ভঙ্গি আছে। এ-জাতীয় মানুষ গল্প করতে এবং গল্প শুনতে ভালবাসে। মিসির আলি বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন।'

'একটা সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই কেবিনটা ছেড়ে অন্য একটা কেবিনে চলে যেতে পারেন। একজন মহিলা এই কেবিনে আসতে চাচ্ছেন।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমি এই মুহূর্তে কেবিন ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এই মুহূর্তে ছাড়তে হবে না। কাল ছাড়লেও হবে।'

ডাক্তার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মিসির আলি বললেন, 'ভদ্রমহিলা বিশেষ করে এই কেবিনে আসতে চাচ্ছেন কেন?'

'তাঁর ধারণা, এই কেবিন খুব লাকি। কেবিনের নম্বর চার শ' নয়। যোগ করলে হয় তের। তের নম্বরটি নাকি তাঁর জন্যে খুব লাকি। সৌভাগ্য-সংখ্যা। নিউমোরলজি'-র হিসাব।'

'কী অদ্ভুত কথা!'

ডাক্তার সাহেব হালকা স্বরে বললেন, 'অসুস্থ অবস্থায় মন দুর্বল থাকে। দুর্বল মনে তের নম্বরটি ঢুকে গেলে সমস্যা।'

'মনের মধ্যে যা ঢুকেছে তা বের করে দিন।'

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, 'এটা তো কোনো কাঁটা না রে ভাই, যে, চিমটা দিয়ে বের করে নিয়ে আসব। এর নাম কুসংস্কার। কুসংস্কার মনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শিকড় ছড়িয়ে দেয়। কুসংস্কারকে তুলে ফেলা আমার মতো সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। যাই ভাই। আপনি তাহলে কাল ভোরে কেবিন নম্বর চার শ' পাঁচে চলে যাবেন। কেবিনটা সিঁড়ির কাছে না, কাজেই হৈ-চৈ হবে না। তা ছাড়া জানালার ভিউ ভালো। গাছপালা দেখতে পারবেন।'

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি এই রুম ছাড়ব না। এখানেই থাকব।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে তাকালেন। কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মিসির আলি বললেন, 'রুম ছাড়ব না, কারণ ছাড়লে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমি এই জীবনে কুসংস্কার প্রশ্রয় দেবার মতো কোনো কাজ করি নি। ভবিষ্যতেও করব না।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি যদি অন্য কোনো কারণ বলতেন, রুম ছেড়ে দিতাম। আমার কাছে চার শ' নয় নম্বর যা, চার শ' পাঁচ-ও তা। তফাত মাত্র চারটা ডিজিটের।'

ডাক্তার সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'আপনি কি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলবেন? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভদ্রমহিলা এ-ঘরে না-আসা পর্যন্ত অপারেশন করাবেন না। অপেক্ষা করবেন। অথচ অপারেশনটা জরুরি।'

'ওঁর অসুবিধা কী?'

'কিডনির কাছাকাছি একটা সিস্টের মতো হয়েছে। আপনি যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভালো হয়। ভদ্রমহিলাকে আপনি চেনেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভালো করেই চেনেন। উনি অনুরোধ করলে না বলতে পারবেন না।'

'নাম কি তাঁর?'

'আমি ওঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি কথা বলুন।'

মিসির আলি তাকিয়ে আছেন।

দরজা ধরে যে-মহিলা দাঁড়িয়ে, তাঁর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও তাঁকে দেখাচ্ছে বালিকার মতো। লম্বাটে মুখ, কাটা-কাটা চেহারা। অসম্ভব রূপবতী। সাধারণত রূপবতীরা মানুষকে আকর্ষণ করে না—একটু দূরে সরিয়ে রাখে। এই মেয়েটির মধ্যে আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। মিসির আলি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটি বলল, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'না।'

'সে কী, চেনা উচিত ছিল তো! আপনি সিনেমা দেখেন না নিশ্চয়ই?'

'না।'

'টিভি? টিভিও দেখেন না? টিভি দেখলেও তো আমাকে চেনার কথা!'

'আমার টিভি নেই। বাড়িওয়ালার বাসায় গিয়ে অবশ্যি মাঝে-মাঝে দেখি। আপনি কি কোনো অভিনেত্রী?'

'হ্যাঁ। এলেবেলে টাইপ অভিনেত্রী নই। খুব নামকরা। রাস্তায় বের হলে ''ট্রাফিক জ্যাম'' হয়ে যাবে।'

মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গিতে মিসির আলি হেসে ফেললেন। মেয়েটিও হাসল। অভিনেত্রীর মাপা হাসি নয়, অন্তরঙ্গ হাসি। সহজ-সরল হাসি।

'আপনি কিন্তু এখনো আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি।'

'কী নাম?'

'আসমানী। এটা আমার আসল নাম। সিনেমার জন্যে আমার ভিন্ন নাম আছে। সেই নাম আপনার জানার দরকার নেই। ভেতরে আসব?'

'আসুন।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। গলার স্বর খানিকটা গম্ভীর করে বলল, 'শুনলাম আপনি নাকি কুসংস্কার সহ্য করতে পারেন না।'

'ঠিকই শুনেছেন। সহ্য করি না এবং প্রশ্রয় দিই না।'

'কুসংস্কার-টুসংস্কার কিছু না। আপনি আপনার ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিন। আমার এই কেবিনটা খুব পছন্দ। আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি। প্লীজ!'

মেয়েটি সত্যি-সত্যি হাতজোড় করল। মিসির আলি লজ্জায় পড়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড!

'আমি এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি। হাতজোড় করতে হবে না।'

'থ্যাংকস।'

'থ্যাংকস বলারও প্রয়োজন নেই, তবে আমার ধারণা, এই কেবিনটিতেও শেষ পর্যন্ত আপনি থাকতে রাজি হবেন না।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কী?'

'আপনি রাতে যখন ঘুমুতে যাবেন তখন হঠাৎ করে দেয়ালের একটা লেখা আপনার চোখে পড়বে—সবুজ মার্কারে কাঁচা-কাঁচা হাতে লেখা—

এই ঘরে যে থাকবে

সে মারা যাবে।

ইহা সত্য, মিথ্যা নয়।

লেখা পড়েই আপনি আঁৎকে উঠবেন। যেহেতু আপনার মন খুব দুর্বল, সেহেতু আপনি আর এখানে থাকবেন না।'

আসমানী বলল, 'কোথায় লেখাটা—দেখি।'

তিনি লেখাটা দেখালেন। আসমানী বলল, 'কে লিখেছে?'

মিসির আলি থেমে-থেমে বললেন, 'যে লিখেছে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তবে আমি অনুমান করতে পারি, একটি বাচ্চা মেয়ের লেখা। মেয়েটির উচ্চতা চার ফুট দু' ইঞ্চি। এবং মেয়েটি এই ঘরেই মারা গেছে।'

আসমানী ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ-সব আপনার অনুমান?'

'জ্বি, অনুমান। তবে যুক্তিনির্ভর অনুমান।'

'যুক্তিনির্ভর অনুমান মানে?'

'এক-এক করে বলি। এটা একটা মেয়ের লেখা তা অনুমান করছি দেয়ালে আঁকা কিছু ছবি দেখে। সবুজ মার্কারে আঁকা বেশ কিছু ছবি আছে, সবই বেণী-বাঁধা বালিকাদের ছবি। মেয়েরা একটা বয়স পর্যন্ত শুধু মেয়েদের ছবি আঁকে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আর মেয়েটির উচ্চতা কীভাবে আঁচ করলেন?'

'মেয়েটির উচ্চতা আঁচ করেছি আরো সহজে। আমরা যখন দেয়ালে কিছু লিখি, তখন লিখি চোখ বরাবর। মেয়েটি বিছানায় বসে-বসে লিখেছে। সেখান থেকে তার উচ্চতা আঁচ করলাম।'

'দাঁড়িয়েও তো লিখতে পারে। হয়তো মেঝেতে দাঁড়িয়ে লিখেছে।'

'তা পারে। তবে মেয়েটি অসুস্থ। বিছানায় বসে-বসে লেখাই তার জন্যে যুক্তি-সঙ্গত।'

আসমানী গম্ভীর গলায় বলল, 'মেয়েটি যে বেঁচে নেই তা কী করে অনুমান করলেন? কাউকে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'না, কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। এটাও অনুমান। বাচ্চারা দেয়ালে লেখার ব্যাপারে খুবই পার্টিকুলার। যা বিশ্বাস করে তা-ই সে দেয়ালে লেখে। যদি বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে যেত তাহলে অবধারিতভাবে এই লেখার জন্যে সে লজ্জিত বোধ করত এবং হাসপাতাল ছেড়ে যাবার আগে লেখাটি নষ্ট করে যেত।'

'আপনি কী করেন জানতে পারি?'

'মাস্টারি করতাম, এখন করি না। পার্ট টাইম টীচার ছিলাম। অস্থায়ী পোস্ট। চাকরি চলে গেছে।'

'আপনি আমাকে দেখে কি আমার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?'

'একটা সামান্য কথা বলতে পারি—আপনার আসল নাম আসমানী নয়। অন্য কিছু।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কী?'

'আসমানী নামটি আপনি এমনভাবে বললেন যাতে আমার কাছে মনে হল অচেনা একটি শব্দ বলছেন। তার চেয়েও বড় কথা আপনার পরনে আসমানী রঙের একটি শাড়ি। শাড়িটি পরার পর থেকেই হয়তো আসমানী নামটা আপনার মাথায় ঘুরছে। প্রথম সুযোগে এই নামটি বললেন।'

'আমার ডাক নাম ''বুড়ি''।'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বুড়ি বলল, 'আপনি অনুমানগুলি কীভাবে করেন?'

'লজিক ব্যবহার করে করি। সামান্য লজিক। লজিক ব্যবহার করার ক্ষমতা সবার মধ্যেই আছে। বেশির ভাগ মানুষই তা ব্যবহার করে না। যেমন আপনি ব্যবহার করছেন না। ভেবে বসে আছেন চার শ' নয় নম্বর ঘরটি আপনার জন্যে লাকি। এ-রকম ভাবার পিছনে কোনো লজিক নেই।'

'লজিকই কি এই পৃথিবীর শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে লজিকই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ কথা—। লজিকের বাইরে কিছু নেই? পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের সমাধান আছে লজিকে, পারবেন বলতে?'

'পারব।'

'ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম। আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'

'আমার নাম মিসির আলি। আপনি কি কাল ভোরে এই কেবিনে আসতে চান? না মত বদলেছেন?'

'আমি কাল ভোরে চলে আসব। যাই মিসির আলি সাহেব। স্লামালিকুম।'

মেয়েটি নিজের কেবিনে ফিরে গেল। রাত দশটার ভেতর সে চার শ' নয় নম্বর কেবিনে আগের রুগীর যাবতীয় তথ্য জোগাড় করল। এই কেবিনে ''লাবণ্য'' নামের দশ বছর বয়সী একটি মেয়ে থাকত। হার্টের ভাল্বের কী একটি জটিল সমস্যায় সে দীর্ঘদিন এই ঘরটিতে ছিল। মারা গেছে মাত্র দশ দিন আগে। তার ওজন তেষট্টি পাউণ্ড। উচ্চতা চার ফুট এক ইঞ্চি।

মিসির আলি সাহেব সামান্য ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন চার ফুট দু' ইঞ্চি। এইটুকু ভুল বোধহয় ক্ষমা করা যায়।

# ২

চার শ' ন' নম্বর কেবিনের ভোল পুরোপুরি পাল্টে গেছে। দেয়াল ঝকঝক করছে, কারণ প্লাষ্টিক পেইন্ট করা হয়েছে। এ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুমের দরজায় ঝুলছে হাল্‌কা নীল পর্দা। বাথরুমের কমোডের ফ্ল্যাশ ঠিক করা হয়েছে। পানির ট্যাপও সারানো হয়েছে। মেঝেতে পানি জমে থাকত—এখন পানি নেই।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বুড়ি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গভীর মনোযোগে খাতায় কী-সব লিখছে। লেখার ব্যাপারটি যে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যাচ্ছে হাতের কাছে বাংলা অভিধান দেখে। সে মাঝে-মাঝেই অভিধান দেখে নিচ্ছে। লেখার গতি খুব দ্রুত নয়। কিছুক্ষণ পরপরই খাতা নামিয়ে রেখে তাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম করতে দেখা যাচ্ছে। এই সময় টেবিল ল্যাম্পটি সে নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে। টেবিল-ল্যাম্পটা খুব সুন্দর। একটিমাত্র ল্যাম্প ঘরের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

বুড়ি লিখছে—

গত পরশু মিসির আলি নামের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পরিচয় বলা ঠিক হচ্ছে না—কারণ আমি তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তিনিও আমার সম্পর্কে কিছু জানেন না। মানুষটি বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই এটা চমৎকার একটা গুণ। কিন্তু তাঁর দোষ হচ্ছে, তিনি একই সঙ্গে অহঙ্কারী। অহঙ্কার—বুদ্ধির কারণে, যেটা আমার ভালো লাগে নি। বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে তিনি আমাকে অভিভূত করতে চেয়েছেন। কেউ আমাকে অভিভূত করতে চাইলে আমার ভালো লাগে না। রাগ হয়। বয়স হবার পর থেকেই দেখছি আমার চারপাশে যারা আসছে, তারাই আমাকে অভিভূত করতে চাচ্ছে। এক-এক বার আমার চেঁচিয়ে বলার ইচ্ছা হয়েছে—হাতজোড় করছি, আমাকে রেহাই দিন। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন। পৃথিবীতে অসংখ্য মেয়ে আছে—যাদের জন্মই হয়েছে অভিভূত হবার জন্যে। তাদের কাছে যান। তাদের অভিভূত করুন, হোয়াই মি?

এই কথাগুলি আমি মিসির আলি সাহেবকে বলতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম—তাঁকে বলতে পারছি না। কারণ উনি আমাকে সত্যি-সত্যি অভিভূত করেছেন। চমকে দিয়েছেন। ছোট বালিকারা যেমন ম্যাজিক দেখে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়, আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। আমি হয়েছি বাক্যহারা। মজার ব্যাপার হচ্ছে—আমার এই বিস্ময়কে তিনি মোটেই পাত্তা দিলেন না। ম্যাজিশিয়ানরা অন্যের বিস্ময় উপভোগ করে। তিনি করেন নি।

সবুজ রঙের দেয়ালের লেখা প্রসঙ্গে যখন আমি যা জেনেছি তা তাঁকে বলতে গেলাম, তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না। আমি যখন তাঁর বিছানার পাশের চেয়ারে বসলাম, তিনি শুকনো গলায় বললেন, "কিছু বলতে এসেছেন?"

আমি বললাম, "না। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।"

তিনি বললেন, "ও।" তাঁর চোখ-মুখ দেখেই মনে হল, তিনি বিরক্ত—মহাবিরক্ত। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারছেন না। চেয়ারে বসেছি, চট করে উঠে যাওয়া ভালো দেখায় না। কাজেই মিসির আলি সাহেবের অসুখটা কি, কত দিন ধরে হাসপাতালে আছেন—এই সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। তিনি নিতান্তই

অনাগ্রহে জবাব দিলেন। আমি যখন বললাম, ''আচ্ছা তাহলে যাই?'' তিনি খুবই আনন্দিত হলেন বলে মনে হল। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ''আচ্ছা-আচ্ছা।'' 'আবার আসবেন'—এই সামান্য বাক্যটি বললেন না। এটা বলাটাই স্বাভাবিক ভদ্রতা।

তাঁর ঘর থেকে ফিরে আমার বেশ কিছু সময় মন খারাপ রইল। আমার জন্যে এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমার একধরনের ডিফেন্স মেকানিজম আছে—অন্যের ব্যবহারে আমি কখনো আহত হই না—কারণ এ-সবকে আমি ছেলেবেলা থেকেই তুচ্ছ করতে শিখেছি।

মিসির আলি সাহেব আমার কিছু উপকার করেছেন, তাঁর নিজের কেবিন ছেড়ে দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন না। এই অধিকার তাঁর নেই। ঘন্টা দুই আগে তিনি যা করলেন তা অপমান ছাড়া আর কী। উনি রেলিং ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ব্লাড ম্যাচিং নাকি কি হাবিজাবি করে উপরে এসেছি। আমার পায়ের শব্দে তিনি তাকালেন।

আমি বললাম, ''ভালো আছেন?''

তিনি কিছু বললেন না। তাকিয়েই রইলেন।

আমি বললাম, ''চিনতে পারছেন তো? আমি বুড়ি।''

তিনি বললেন, ''ও—আচ্ছা।''

'ও—আচ্ছা' কোনো বাক্য হয়? এত তাচ্ছিল্য করে কেউ কখনো আমাকে কিছু বলে নি। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার উচিত ছিল আর কোনো কথা না-বলে নিজের কেবিনে চলে আসা। তা না-করে আমি গায়ে পড়ে বললাম, ''আজ আপনার শরীরটা মনে হয় ভালো, হাঁটাহাঁটি করছেন।'' তার উত্তরে তিনি আবারও বললেন, ''ও—আচ্ছা।''

তার মানে হচ্ছে আমি কি বলছি না-বলছি তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। দায়সারা 'ও—আচ্ছা' দিয়ে সমস্যা সমাধান করছেন। আমি তো তাঁকে বিরক্ত করার জন্যে কিছু বলি নি। আমি কাউকে বিরক্ত করার জন্যে কখনো কিছু করি না। উল্টোটাই সবসময় হয়। লোকজন আমাকে বিরক্ত করে। ক্রমাগত বিরক্ত করে।

মিসির আলি নামের আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান এই মানুষটি আমাকে অপমান করছেন। কে জানে, হয়তো জেনেশুনেই করছেন। মানুষকে অপমান করার সূক্ষ্ম পদ্ধতি সবার জানা থাকে না, অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান মানুষরাই শুধু জানেন এবং অকারণে প্রয়োগ করেন। সেই সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত না। আমি শীতল গলায় বললাম, ''মিসির আলি সাহেব।''

উনি চমকে তাকালেন। আমি বললাম, ''ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?''

''চিনব না কেন?''

''আমি যা-ই জিজ্ঞেস করছি আপনি বলছেন—'ও আচ্ছা'। এর কারণটা কি আপনি আমাকে বলবেন?''

''আপনি কী বলছেন আমি মন দিয়ে শুনি নি। শোনার চেষ্টাও করি নি। মনে হয় সে-জন্যেই 'ও আচ্ছা' বলছি।''

''কেন বলুন তো?''

"আমি প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি। এই উপসর্গ নতুন হয়েছে, আগে ছিল না। আমি মাথাব্যথা ভুলে থাকার জন্যে নানান কিছু ভাবছি। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছি।"

আমি বললাম, "মাথাব্যথার সময় আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।"

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের মাথাব্যথার গল্প বিশ্বাস করলাম না। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে এমন শান্ত ভঙ্গিতে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না, এবং প্রচণ্ড মাথাব্যথায় এত সুন্দর যুক্তিভরা কথাও মনে আসে না। ভদ্রলোকের মানসিকতা কী তা মনে হয় আমি আঁচ করতে পারছি। কিছু-কিছু পুরুষ আছে, যারা রূপবতী তরুণীদের অগ্রাহ্য করে একধরনের আনন্দ পায়। সচরাচর এরা নিঃসঙ্গ ধরনের পুরুষ হয়, এবং নারীসঙ্গের জন্যে তীব্র বাসনা বুকে পুষে রাখে।

মিসির আলি সাহেব যে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, তা এই দু' দিনে আমি বুঝে ফেলেছি। এই ভদ্রলোককে দেখতে কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব এখন পর্যন্ত আসে নি। আমাদের দেশে গুরুতর অসুস্থ একজনকে দেখতে কেউ আসবে না তা ভাবাই যায় না। একজন কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে তার আত্মীয়স্বজন আসে, বন্ধুবান্ধব আসে, পাড়া-প্রতিবেশী আসে, এমনকি গলির মোড়ের যে মুদীদোকানি—সে-ও আসে। এটা একধরনের সামাজিক নিয়ম। মিসির আলির জন্যে কেউ আসছে না।

অবশ্যি আমাকে দেখতেও কেউ আসছে না। আমার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। আমি কাউকেই কিছু জানাই নি। যারা জানে তাদের কঠিনভাবে বলা হয়েছে তারা যেন আমাকে দেখতে না-আসে। তারা আসছে না, কারণ আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তাদেরই সমস্যা।

আচ্ছা, আমি এই মানুষটিকে নিয়ে এত ভাবছি কেন? নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষকে নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা করার কোনো মানে হয়। আমি নিজে নিঃসঙ্গ বলেই কি একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি মমতাবোধ করছি?

ভদ্রলোক আমার প্রতি অবহেলা দেখিয়েছেন, আমি তাতে কষ্ট পাচ্ছি। আমরা অতি প্রিয়জনদের অবহেলাতেই কষ্ট পাই। কিন্তু এই ভদ্রলোক তো আমার অতি প্রিয় কেউ নন। আমরা দু' জন দু' প্রান্তের মানুষ। তাঁর জগৎ ভিন্ন, আমার জগৎ ভিন্ন। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার পর আর কখনো হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এই হাসপাতালে যে-ক'টা দিন আছি সেই ক'টা দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পটল্প করলে আমার ভালো লাগবে। কারো সঙ্গে কথা বলেই আমি আরাম পাই না। যার সঙ্গেই কথা বলি, আমার মনে হয় সে ঠিকমতো কথা বলছে না। ভান করছে। নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে। যেন সে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। সে ধরেই নিচ্ছে তার কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে আমি মনে-মনে তার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা করছি, অথচ আমি যে মনে-মনে অসংখ্য বার বলছি হাঁদারাম, হাঁদারাম, তুই হাঁদারাম, সেই ধারণাও তার নেই।

মিসির আলি নিশ্চয়ই সে-রকম হবেন না। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি কখনো মনে-মনে বলব না—'হাঁদারাম'। আমার নিজের একটি নিতান্তই ব্যক্তিগত গল্প আছে, যা আমি খুব কম মানুষকেই বলেছি। এই গল্পটাও হয়তো আমি

তাঁকে বলতে পারি। আমার এই গল্প আমি যাঁদেরকে বলেছি তাঁদের সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন, তারপর বলেছেন–আপনার মানসিক সমস্যা আছে। ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যান।

মানুষ এই এক নতুন জিনিস শিখেছে, কিছু হলেই সাইকিয়াট্রিস্ট। মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। সাইকিয়াট্রিস্ট সেই এলোমেলো মাথা ঠিক করে দেবেন। মানুষের মাথা কি এমনই পলকা জিনিস যে সামান্য আঘাতেই এলোমেলো হয়ে যাবে? এই কথাটিও মিসির আলি সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, কাজেই ছাত্রীর মতো ভঙ্গিতে খানিকটা ভয়ে–ভয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যায়—আচ্ছা স্যার, মানুষের মাথা এলোমেলো হবার জন্যে কত বড় মানসিক আঘাতের প্রয়োজন? তখন তিনি নিশ্চয় এই প্রশ্নের জবাব দেবেন। সেই জবাবের গুরুত্ব থাকবে। কারণ মানুষটির ভেতর লজিকের অংশ বেশ শক্ত।

## ৩

বুড়ি বলল, 'স্যার, আসব?'

মিসির আলি বিছানায় কাত হয়ে বই পড়ছিলেন—বইটির নাম—'Mysteries ofafterlife'—লেখক F.Smyth.। মজার বই। মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে এমন সব বর্ণনা আছে, যা পড়লে মনে হয় লেখকসাহেব ঐ জগৎ ঘুরে এসেছেন। বেশ কিছুদিন সেখানে ছিলেন। ভালোমতো সবকিছু দেখা। এ– জাতীয় বই যে লেখা হয়, ছাপা হয় এবং হাজার–হাজার কপি বিক্রি হয় এটাই এক বিস্ময়।

তিনি বই বন্ধ করে বুড়ির দিকে তাকালেন। মেয়েটির সঙ্গে বেশ কয়েকবার তাঁর দেখা হয়েছে। মেয়েটির ভাবভঙ্গিতে মনে হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে সে একধরনের আগ্রহ বোধ করছে। আগ্রহের কারণ স্পষ্ট নয়। তার কি কোনো সমস্যা আছে? থাকতে পারে।

মিসির আলি এই মুহূর্তে অন্যের সমস্যা নিয়ে ভাবতে চাচ্ছেন না। তাঁর নিজের সমস্যাই প্রবল। শরীর–সমস্যা। ডাক্তাররা অসুখের ধরন এখনো ধরতে পারছেন না। বলছেন যকৃতের একটা অংশ কাজ করছে না। যকৃৎ মানুষের শরীরের বিশাল এক যন্ত্র। সেই যন্ত্রের অংশবিশেষ কাজ না–করলেও অসুবিধা হবার কথা নয়। তাহলে অসুবিধা হচ্ছে কেন? মাথার যন্ত্রণাই–বা কেন হচ্ছে? টিউমারজাতীয় কিছু কি হয়ে গেল? টিউমার বড় হচ্ছে–মস্তিষ্কে চাপ দিচ্ছে। সেই চাপটা শুধু সন্ধ্যার পর থেকে দিচ্ছে কেন?

বুড়ি আবার বলল, 'স্যার, আমি কি আসব?'

মেয়েটির পরনে প্রথম দিনের আসমানী রঙের শাড়ি। হয়তো এই শাড়িটিই তার ''লাকি শাড়ি''। অপারেশন টেবিলে যাবার আগে সে বলবে–আমাকে এই লাকি শাড়িটা পরতে দিন। প্লীজ ডাক্তার, প্লীজ।

রাত আটটা প্রায় বাজে। এমন কিছু রাত নয়, তবু মিসির আলির ঘুম পাচ্ছে। কারো সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তিনি তার পরেও বললেন, 'আসুন, আসুন।'

বুড়ি ঘরে ঢুকল না। দরজার ও-পাশ থেকেই বলল, 'আপনার কি মাথা ধরা আছে?'

'এখন নেই। রোজই সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়। আজ এখনো কেন যে শুরু হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।'

বুড়ি হাসতে-হাসতে বলল, 'মনে হচ্ছে মাথা না-ধরায় আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে। স্যার, আমি কি বসব?'

'বসুন, বসুন। আমাকে স্যার বলছেন কেন তা তো বুঝতে পারছি না!'

'আপনি শিক্ষক-মানুষ, এই জন্যেই স্যার বলছি। ভালো শিক্ষক দেখলেই ছাত্রী হতে ইচ্ছা করে।'

'আমি ভালো শিক্ষক, আপনাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নি। আমার মনে হচ্ছে। আপনি কথা বলার সময় খুব জোর দিয়ে বলেন। এমনভাবে বলেন যে, যখন শুনি মনে হয় আপনি যা বলছেন তা মনে- প্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন। ভালো শিক্ষকের এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত।'

'দ্বিতীয় শর্ত কী?'

'দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে জ্ঞান। ভালো শিক্ষককে প্রচুর জানতে হবে এবং ভালোমতো জানতে হবে।'

'আপনি নিজেও কিন্তু শিক্ষকের মতো কথা বলছেন।'

বুড়ি বলল, 'আমার জীবনের ইচ্ছা কী ছিল জানেন? কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষিকা হওয়া। ফ্রক-পরা ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াবে, আমি তাদের পড়াব, গান শেখাব। ব্যথা পেয়ে কাঁদলে আদর করব। অথচ আমি কী হয়েছি দেখুন-একজন অভিনেত্রী। আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড বয়স্ক মানুষ নিয়ে। আমার জীবনে শিশুর কোনো স্থান নেই। স্যার, আমি কী বকবক করে আপনাকে বিরক্ত করছি?'

'না, করছেন না।'

'আপনি আমাকে তুমি করে ডাকলে আমি খুব খুশি হব। আপনি আমাকে তুমি করে ডাকবেন, এবং নাম ধরে ডাকবেন। প্লীজ।'

'বুড়ি ডাকতে বলছ?'

'হ্যাঁ, বুড়ি ডাকবেন। আমার ডাক নামটা বেশ অদ্ভুত না? যখন সত্যি-সত্যি বুড়ি হব, তখন বুড়ি বলে ডাকার কেউ থাকবে না।'

মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি সবসময় এমন গুছিয়ে কথা বল?'

'আপনার কী ধারণা?'

'আমার ধারণা তুমি কম কথা বল। যারা কথা বেশি বলে, তারা গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। যারা কম কথা বলে, তারা যখন বিশেষ কোনো কথা বলতে চায়, তখন খুব গুছিয়ে বলতে পারে। আমার ধারণা তুমি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছ।'

'আপনার ধারণা সত্যি নয়। আমি আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না। আগামীকাল আমার অপারেশন। ভয়ভয় লাগছে। ভয় কাটানোর জন্যে আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।'

'ভয় কেটেছে?'

'কাটে নি। তবে ভুলে আছি। আপনার এখান থেকে যাবার পর—গরম পানিতে গোসল করব। আয়াকে গরম পানি আনতে বলেছি। গোসলের পর কড়া ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।'

মিসির আলি হাই তুললেন। মেয়েটির কথা এখন আর শুনতে ভালো লাগছে না। তাকে বলাও যাচ্ছে না—তুমি এখন যাও। আমার মাথা ধরেছে। মাথা সত্যি- সত্যি ধরলে—বলা যেত। মাথা ধরে নি।

'আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন স্যার?'

মিসির আলি হেসে ফেলে বললেন, 'গল্পটা বল।'

'কোন গল্পটা বলব?'

'কেউ যখন জানতে চায়, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন, তখন তার মাথায় একটা ভূতের গল্প থাকে। ঐটা সে শোনাতে চায়। তুমিও চাচ্ছ।'

'আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনাকে কোনো গল্প শোনাতে চাচ্ছি না। কোনো ভৌতিক গল্প আমার জানা নেই।'

'ও, আচ্ছা।'

'আর একটা কথা, আপনি দয়া করে ''ও আচ্ছা'' বাক্যটি বলবেন না, এবং নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করবেন না।'

'বুড়ি, তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'আমাকে তুমি-তুমি করেও বলবেন না।'

বুড়ি উঠে দাঁড়াল এবং প্রায় ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, প্রকৃতি অনুমাত্র মেয়েদের মধ্যেই বিপরীত গুণাবলীর দর্শনীয় সমাবেশ ঘটিয়েছে। মেয়েকে যেহেতু সবসময়ই সন্তান ধারণ করতে হয়, সেহেতু প্রকৃতি তাকে করল—শান্ত, ধীর স্থির। একই সঙ্গে ঠিক একই মাত্রায় তাকে করল—অশান্ত, অধীর, অস্থির। প্রকৃতির এইসব হিসাব-নিকাশ খুব মজার। দেখে মনে হয় পরিহাসপ্রিয় প্রকৃতি সবসময়ই মজার খেলা খেলছে।

মিসির আলি বই খুললেন, মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে মিথ সাহেবের বক্তব্য পড়া যাক।

"স্থূল দেহের ভেতরই লুকিয়ে আছে মানুষের সূক্ষ্ম দেহ। সেই দেহকে বলে বাইওপ্লাজমিক বডি। স্থূলদৃষ্টিতে সেই দেহ দেখা যায় না। স্থূল দেহের বিনাশ হলেই সূক্ষ্ম দেহ বা বাইওপ্লাজমিক বডি স্থূল দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহ শক্তির মতো। শক্তির যেমন বিনাশ নেই-সূক্ষ্ম দেহেরও তেমনি বিনাশ নেই। সূক্ষ্ম দেহের তরঙ্গধর্ম আছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য, স্থূল দেহের কামনা-বাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যার কামনা-বাসনা বেশি তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেশি।"

মিসির আলি বই বন্ধ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মিথ নামের এই লোক কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে তাঁর গ্রন্থটি ভারিক্কি করার চেষ্টা করেছেন। নিজের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন পাঠকদের কাছে। গ্রন্থের শুভ ভূমিকার কথাই সবাই বলে—গ্রন্থের যে কী প্রচণ্ড ''ঋণাত্মক'' ভূমিকা আছে, সে-সম্পর্কে কেউ কিছু বলে না। একজন ক্ষতিকর মানুষ সমাজের যতটা ক্ষতি করতে পারে, তারচেয়ে এক শ' গুণ বেশি ক্ষতি করতে পারে সেই মানুষটির লেখা একটি বই। বইয়ের কথা বিশ্বাস করার

আমাদের যে–প্রবণতা, তার শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। একটা বই মাটিতে পড়ে থাকলে তা মাটি থেকে তুলে মাথায় ঠেকাতে হয়। এই ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে সুদূর শৈশবে।

'স্যার, আসব?'

মেয়েটি আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অপরাধে সে নিজেকে অপরাধী করে কষ্ট পাচ্ছে।

'স্যার, আসব?'

মিসির আলি হাসতে–হাসতে বললেন, 'না।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে–বসতে বলল, 'একটু আগে নিতান্ত বালিকার মতো যে–ব্যবহার আপনার সঙ্গে আমি করেছি, এ–রকম ব্যবহার আমি কখনোই কারো সঙ্গেই করি না। আপনার সঙ্গে কেন করলাম তা–ও জানি না। আপনার কাছেই আমি জানতে চাচ্ছি–কেন এমন ব্যবহার করলাম?'

মিসির আলি বললেন, 'এটা বলার জন্যে তুমি আস নি। অন্য কিছু বলতে এসেছ–সেটাই বরং বল।'

বুড়ি নিচু গলায় বলল, 'আমি খুব বড় ধরনের একটা সমস্যায় ভুগছি। কষ্ট পাচ্ছি। ভয়ংকর কষ্ট পাচ্ছি। আমার সমস্যাটা কেউ–একজন বুঝতে পারলে আমি কিছুটা হলেও শান্তি পেতাম। মনে হয় আপনি বুঝবেন।'

'বোঝার চেষ্টা করব। বল তোমার সমস্যা।'

'বড় একটা খাতায় সব লেখা আছে। খাতাটা আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি ধীরেসুস্থে আপনার অবসর সময়ে পড়বেন। তবে একটি শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'কাল আমার অপারেশন হবে। আমি মারাও যেতে পারি। যদি মারা যাই, তাহলে আপনি এই খাতায় কি লেখা তা পড়বেন না। খাতাটা নষ্ট করে ফেলবেন। আর যদি বেঁচে থাকি তবেই পড়বেন।'

মিসির আলি বললেন, 'তোমার এই শর্ত পালনের জন্যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি খাতাটা তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি মরে গেলে আমি খাতাটা পাব না। বেঁচে থাকলে তুমি নিজেই আমাকে দিতে পারবে।'

'খাতাটা আমি আমার কাছে রাখতে চাচ্ছি না। আমি চাই না অন্য কেউ এই লেখা পড়ুক। আমি মারা গেলে সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। আপনার কাছে খাতাটা থাকলে এই দুশ্চিন্তা থেকে আমি মুক্ত থাকব।'

'দাও তোমার খাতা।'

'কাল ভোরবেলা অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে–আগে আপনার কাছে পাঠাব।'

'ভালো কথা, পাঠিও।'

'এখন আপনি কোনো–একটা হাসির গল্প বলে আমার মন ভালো করে দিন।'

'আমি কোনো হাসির গল্প জানি না।'

'বেশ, তাহলে একটা দুঃখের কথা বলে মন খারাপ করিয়ে দিন। অসম্ভব

খারাপ করে দিন। যেন আমি হাউমাউ করে কাঁদি।'

রাতের বেলার রাউন্ডের ডাক্তার এসে মিসির আলির ঘরে বুড়িকে দেখে খুব বিরক্ত হলেন। কড়া গলায় বললেন, 'কাল আপনার অপারেশন। আপনি ঘুরে- ফিরে বেড়াচ্ছেন, এর মানে কী?'

বুড়ি শান্ত গলায় বলল, 'এমনও তো হতে পারে ডাক্তার সাহেব যে আজ রাতই আমার জীবনের শেষ রাত। মৃত্যুর পর কোনো-একটা জগৎ থাকলে ভালো কথা, কিন্তু জগৎ তো না-ও থাকতে পারে। তখন?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'প্লীজ, আপনি নিজের ঘরে যান। বিশ্রাম করুন।'

বুড়ি উঠে চলে গেল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?'

'সম্প্রতি হয়েছে।'

'উনি তো ডেনজারাস মহিলা।'

'ডেনজারাস কোন অর্থে বলছেন?'

'সব অর্থেই বলছি। যে-কোনো সিনেমা-পত্রিকা খুঁজে বের করুন—ওঁর সম্পর্কে কোনো-না-কোনো স্ক্যান্ডালের খবর পাবেন। একবার সুইসাইড করার চেষ্টা করেছেন-একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়েছিলেন। এই হাসপাতালেই চিকিৎসা হয়। একবার গায়ে আগুন লাগাবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর বাঁ পায়ের স্কিন অনেকখানিই নষ্ট। বাইরে থেকে স্কিন গ্রাফটিং করিয়েছেন।'

'মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্র।'

'অনেকের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। আমার কাছে কখনো মনে হয় না। এই মহিলার লক্ষ লক্ষ টাকা। ইচ্ছা করলেই তিনি ইংল্যান্ড আমেরিকায় গিয়ে অপারেশনটা করাতে পারেন। দেশেও নামী-দামী ক্লিনিক আছে, সেখানে যেতে পারেন। তা যাবেন না। এসে উঠবেন সরকারি হাসপাতালে। কেন বলুন তো?'

'কেন?'

'পাবলিসিটি, আর কিছুই না। অপারেশন হয়ে যাবার পর পত্রিকায় খবর হবে—অমুক হাসপাতালে অপারেশন হয়েছে। স্রোতের মতো ভক্ত আসবে। হসপিটাল অ্যাডমিনিসট্রেশন কলাপস্ করবে। আমাদের পুলিশে খবর দিতে হবে। পুলিশ লাঠি চার্জ করবে। আবারও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় নিউজ হবে। হাসপাতাল থেকে রিলিজ্ড্ হয়ে যাবার পর তিনি খবরের কাগজে ইন্টারভ্যু দেবেন। সাংবাদিক জিজ্ঞেস করবে, আপনি বিদেশে চিকিৎসা না-করিয়ে এখানে কেন করালেন? তিনি হাসিমুখে জবাব দেবেন—'আমি দেশকে বড় ভালবাসি।' খবরের কাগজে তার হাস্যমুখী ছবি ছাপা হবে। নিচে লেখা—রূপা চৌধুরী দেশকে ভালবাসেন।

'তাঁর নাম রূপা চৌধুরী?'

'কেন, আপনি জানতেন না?'

'না।'

'রূপা চৌধুরীর নাম জানেন না শুনলে লোকে হাসবে। ওর কথা বাদ দিন; আপনি কেমন আছেন বলুন। মাথাধরা শুরু হয়েছে?'

'এখনো হয় নি, তবে হবে-হবে করছে।'

'আগামী বুধবার পিজিতে আপনার ব্রেনের একটা ক্যাট স্ক্যান করা হবে।'

'টিউমার সন্দেহ করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সর্বনাশ!'

'আগে ধরা পড়ুক, তারপর বলবেন সর্বনাশ। তবে সর্বনাশ বলার কিছু নেই—মস্তিষ্কের টিউমার প্রায় কখনোই ম্যালিগনেন্ট হয় না। তা ছাড়া মস্তিষ্কের অপারেশন প্রায়ই হয়। অপারেশন তেমন জটিলও নয়। নিউরো সার্জনরা আমার কথা শুনলে রেগে যাবেন, তবে কথা সত্যি।'

# ৪

ডাক্তার সাহেবের কথা সত্যি।

অপারেশন শেষ হবার পরপরই খবর ছড়িয়ে পড়ল রূপা চৌধুরী এই হাসপাতালে আছেন। হাজার-হাজার লোক আসতে থাকল। সে এক দর্শনীয় ব্যাপার!

মিসির আলি খবর পেলেন অপারেশন ঠিকঠাকমতো হয়েছে। মেয়েটি ভালো আছে। এটিও আনন্দিত হবার মতো ব্যাপার। তার দিয়ে যাওয়া খাতাটা পড়া শুরু করা যায়। পড়তে ইচ্ছা করছে না। অসুস্থ অবস্থায় কোনোকিছুতেই মন বসে না।

ক্যাট স্ক্যান করা হয়েছে। কিছু পাওয়া যায় নি। তার চেয়েও বড় কথা লিভারের সমস্যা বলে যা ভাবা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সমস্যা সেখানে নয়। মেডিক্যাল কলেজের যে-অধ্যাপক চিকিৎসা করছিলেন, তিনি গতকাল বলেছেন, 'আপনার শরীরে তো কোনো অসুখ পাচ্ছি না। অসুখটা আপনার মনে নয় তো?'

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

প্রফেসর সাহেব বললেন, 'হাসছেন কেন? আপনি মনোবিদ্যার একজন ওস্তাদ মানুষ তা জানি—কিন্তু মনোবিদ্যার ওস্তাদ মানুষদের মনের রোগ হবে না, এমন তো কোনো কথা নেই। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেরও ক্যান্সার হয়। হয় না?'

'অবশ্যই হয়। তবে মনের রোগ এবং জীবাণু বা ভাইরাসঘটিত রোগকে এক লাইনে ফেলা ঠিক হবে না।'

'আচ্ছা, ফেলছি না। আপনাকে আমার যা বলার তা বললাম, আপনার অসুস্থতার কোনো কারণ ধরা যাচ্ছে না।'

'আপনি কি আমাকে হাসপাতাল ছেড়ে দিতে বলছেন?'

'শুধু-শুধু কেবিনের ভাড়া গোনার তো আমি কোনো অর্থ দেখি না। অবশ্যি একটা উপকার হচ্ছে। বিশ্রাম হচ্ছে। যে-কোনো রোগের জন্যেই বিশ্রাম একটা ভালো অষুধ। সেই বিশ্রাম আপনি বাড়িতে গিয়েও করতে পারেন।'

'তা পারি।'

'আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই মিসির আলি সাহেব?'

'দিন।'

'ময়মনসিংহের গ্রামে আমার সুন্দর একটা বাড়ি আছে। পৈত্রিক বাড়ি—যা সারা

বছর খালি পড়ে থাকে। আপনি আমার ঐ বাড়িতে কিছুদিন থেকে আসুন না।'

'আপনার পৈত্রিক বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'এই বিশেষ ফেভার আপনি কেন করতে চাচ্ছেন? আমি আপনার একজন সাধারণ রুগী। এর বেশি কিছু না। আপনি নিশ্চয়ই আপনার সব রুগীদের হাওয়া বদলের জন্যে আপনার পৈত্রিক বাড়িতে পাঠান না।'

'তা পাঠাই না..... ।'

'আমাকে পাঠাতে চাচ্ছেন কেন?'

'আমি যদি বলি মানুষ হিসেবে আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে, তাহলে কি আপনার বিশ্বাস হবে?'

'বিশ্বাস হবে না। যে-সব গুণাবলী একজন মানুষকে সবার কাছে প্রিয় করে তার কিছুই আমার নেই। আমি শুকনো ধরনের মানুষ। গল্প করতে পারি না। গল্প শুনতেও ভালো লাগে না।'

ডাক্তার সাহেব উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, 'আমার বড় মেয়েটি আপনার ছাত্রী। তার ধারণা, আপনি অসাধারণ একজন মানুষ। সে চাচ্ছে যেন আপনার জন্যে বিশেষ কিছু করা হয়।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখে-এটা তিনি লক্ষ করেছেন। যদিও তার কোনো কারণ বের করতে পারেন নি। অন্য দশ জন শিক্ষক যেভাবে ক্লাস নেন তিনিও সেভাবেই নেন। এর বেশি তো কিছু করেন না। তার পরেও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা এ-রকম ভাবে কেন? রহস্যটা কী?

'মিসির আলি সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমার বড় মেয়ের স্বামী ধনবান ব্যক্তি। আমার বড় মেয়ে চাচ্ছে তার খরচে আপনাকে বাইরে পাঠাতে, যাতে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। আপনি রেগে যাবেন কি না এই ভেবেই এ-প্রস্তাব এতক্ষণ দিই নি।'

'আপনার বড় মেয়ের নাম কি?'

'আমার মেয়ে বলেছে আপনি তার নাম জানতে চাইলে নাম যেন আমি না বলি। সে তার নাম জানাতে চাচ্ছে না। আপনি কি আমার মেয়ের প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন?'

'না, তবে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করব। আপনার পৈত্রিক বাড়িতে কিছুদিন থাকব। বাড়ি নিশ্চয়ই খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ—খুবই সুন্দর। সামনে নদী আছে। আপনার জন্যে নৌকার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছা করলে নৌকায় রাত্রিযাপন করতে পারবেন। পাকা বাড়ি। দোতলায় বারান্দা বেশ বড়। বারান্দায় এসে দাঁড়ালে ঘরে যেতে ইচ্ছা করে না—এমন।'

মিসির আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না।'

'গিয়ে দেখুন, এখন হয়তো করবে। অসুস্থ মানুষকে প্রকৃতি খুব প্রভাবিত করে। পরিবেশেরও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। আমি কি ব্যবস্থা করব?'

'করুন।'

'দিন পাঁচেক সময় লাগবে। আমি একজন ডাক্তারের ব্যবস্থাও করব। আমার ছাত্র গৌরীপুর শহরে প্র্যাকটিস করে। তাকে চিঠি লিখে দেব, যাতে তিন–চার দিন পরপর সে আপনাকে দেখে আসে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে চিন্তা করবেন না। বজলু আছে। সে হচ্ছে একের ভেতর তিন। কেয়ার টেকার, কুক এবং দারোয়ান। এই তিন কাজেই সে দক্ষ। বিশেষ করে রান্না সে খুব ভালো করে। মাঝে–মাঝে তার রান্নার প্রশংসা করবেন। দেখবেন সে কত খুশি হয়।'

ডাক্তার সাহেবের পৈত্রিক বাড়ি বারোকাদায়।

ময়মনসিংহ–মোহনগঞ্জ লাইনের অতিথপুর স্টেশনে নেমে ছ' মাইল যেতে হয় রিকশায়, দু' মাইল হেঁটে, এবং বাকি দু'–তিন মাইল নৌকায়।

মিসির আলির খুবই কষ্ট হল। অতিথপুর থেকে রওনা হয়ে বেশ কয়েকবার মনে হল, না–গেলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন একটামাত্র কারণে– ডাক্তার সাহেব নানান জোগাড়–যন্তর করে রেখেছেন। লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। এরপরে না–যাওয়াটা অন্যায়।

ডাক্তার সাহেবের পৈত্রিক বাড়ি খুবই সুন্দর। সম্প্রতি চুনকাম করা হয়েছে বলেই বোধহয়—সবুজের ভেতর ধবধবে সাদা বাড়ি ঝকঝক করছে। বাড়ি দেখে খুশি হবার বদলে মিসির আলির মন খারাপ হয়ে গেল। এত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে। খাঁ–খাঁ করছে। কোনো মানে হয়? বাড়ির জন্যে তো মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই বাড়ি।

বাড়ির সামনে নদী না—খালের মতো আছে। অল্প পানি। সেই পানিতেই পানসিজাতীয় বিরাট এক নৌকা। বজলু হাসিমুখে বলল—'স্যার, নৌকা আপনার জন্যে। বড় আপা চিঠি দিয়েছে—যেন প্রত্যেক বিকালে নৌকার মধ্যে আপনার চা দিই।'

'ঠিক আছে, নৌকাতে চা দিও।'

'আগামীকাল কী খাবেন, স্যার যদি বলেন। মফস্বল জায়গা। আগে–আগে না–বললে জোগাড়–যন্তর করা যায় না। রাতের ব্যবস্থা আছে কই মাছ, শিং মাছ। মাংসের মধ্যে আছে কবুতরের মাংস। মাছের মাথা দিয়া মাষকালাইয়ের ডাল রানধা করছি।'

'যথেষ্ট হয়েছে। দেখ বজলু খাওয়াদাওয়া নিয়ে তুমি বেশি ব্যস্ত হয়ো না। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ খুব কম। দুই পদের বেশি কখনো রান্না করবে না।'

বজলু সব ক'টা দাঁত বের করে হেসে ফেলল—

'আপনি বললে তো স্যার হবে না। বড় আপা চিঠি দিয়ে দিয়েছেন—লিখেছেন, স্যারের যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয়। সবসময় খুব কম করে হলেও যেন প্রতি বেলা পাঁচ পদের আয়োজন হয়। আমি স্যার অনেক কষ্টে পাঁচ পদের ব্যবস্থা করেছি—কই মাছের ভাজি, শিং মাছের ঝোল, কবুতরের মাংস, বেগুন ভর্তা আর ডাল। আগামীকাল কী করি, এই চিন্তায় আমি অস্থির।'

'অস্থির হবার কোনো প্রয়োজন নেই বজলু। আপাতত চা খাওয়াও।'

'তাহলে স্যার নৌকায় গিয়া বসেন। বিছানা পাতা আছে। আপা বলে দিয়েছেন নৌকায় চা দেওয়ার জন্যে।'

মিসির আলি সাহেব নৌকাতেই বসলেন। তাঁর মন বলছে, বজলু তাঁকে বিরক্ত করে মারবে। ভালবাসার অত্যাচার, কঠিন অত্যাচার। একে গ্রহণও করা যায় না, বর্জনও করা যায় না।

নৌকায় বসে মিসির আলি একটা মজার জিনিস লক্ষ করলেন। খাল বরাবর আমগাছগুলি টিয়া পাখিতে ভর্তি। দশ–পনেরটি নয়, শত–শত। এরা যখন ওড়ে তখন আর এদের সবুজ দেখায় না। কালো দেখায়। এর মানে কী? টিয়া কালো দেখাবে কেন? চলমান সবুজ রঙ যদি কালো দেখায়, তাহলে তো চলন্ত ট্রেনের সবুজ কামরাগুলিও কালো দেখানোর কথা। তা কি দেখায়? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। বজলুকে একবার পাঠাতে হবে চলন্ত ট্রেন দেখে আসার জন্যে। সে দেখে এসে বলুক।

প্রথম রাতে মিসির আলির ভালো ঘুম হল না। প্রকাণ্ড বড় খাট–তাঁর মনে হতে লাগল তিনি মাঠের মাঝখানে শুয়ে আছেন। বাতাসও খুব সমস্যা করতে লাগল। জানালা দিয়ে এক–একবার দমকা হাওয়া আসে, আর তাঁর মনে হয় তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মাঝরাতে দরজা–জানালা বন্ধ করে তিনি বুড়ির খাতা নিয়ে বসলেন।

## ৫

আমার বাবা মারা যান, যখন আমার বয়স পনের মাস।

বাবার অভাব আমি বোধ করি নি, কারণ বাবা সম্পর্কে আমার কোনো স্মৃতি নেই। স্মৃতি থাকলেই অভাববোধের ব্যাপারটা চলে আসত। আমাকে মানুষ করেছেন আমার মা। তিনি অত্যন্ত সাবধানী মহিলা। বাবার অভাব যাতে আমি কোনোদিন বুঝতে না–পারি, তার সবরকম চেষ্টা তিনি বাবার মৃত্যুর পর থেকেই করে আসছেন। তিনি যা–যা করেছেন তার কোনোটিই কোনো সুস্থ মহিলা কখনো করবেন না। মা হচ্ছেন একজন অসুস্থ, অস্বাভাবিক মহিলা। যেহেতু জন্ম থেকেই আমি তাঁকে দেখে আসছি, তাঁর অস্বাভাবিকতা আমার চোখে ধরা পড়তে অনেক সময় লেগেছে।

বাবার মৃত্যুর পর ঘর থেকে তাঁর সমস্ত ছবি, ব্যবহারি জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়—কিছু নষ্ট করে দেওয়া হয়, কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমার দাদার বাড়িতে। মা'র যুক্তি ছিল—বাবার স্মৃতিজড়িত কিছু তাঁর চারপাশে রাখতে পারবেন না। স্মৃতির কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

বাবা কেমন ছিলেন, তিনি কী করতেন, কী গল্প করতেন—এ–সব নিয়েও মা কখনো আমার সঙ্গে কিছু বলেন নি। বাবার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তাঁর নাকি অসম্ভব কষ্ট হয়। মা এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বাবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। বাবার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আমার নাম 'তিতলী', যা বাবা আগ্রহ করে রেখেছিলেন তা–ও বদলানো হল। আমার নতুন নাম হল রূপা। তিতলী নাম মা বদলালেন, কারণ এই নাম তাঁকে বাবার কথা মনে করিয়ে দিত।

মা অসম্ভব রূপবতী। আরেকটি বিয়ে করাই মা'র জন্যে স্বাভাবিক ছিল। পাত্রের অভাব ছিল না। রূপবতীদের পাত্রের অভাব কখনো হয় না। মা বিয়ে করতে রাজি

হলেন না। বিয়ের বিপক্ষে একটি যুক্তি দিলেন, যে–ছেলেটিকে বিয়ে করব তার স্বভাব–চরিত্র যদি রূপার বাবার চেয়ে খারাপ হয়, তাহলে কখনো তাকে ভালবাসতে পারব না। দিনরাত রূপার বাবার সঙ্গে তার তুলনা করে নিজে কষ্ট পাব, তাকেও কষ্ট দেব। সেটা ঠিক হবে না। আর যদি ছেলেটি রূপার বাবার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে রূপার বাবাকে আমি ক্রমে–ক্রমে ভুলে যাব। তাও ঠিক হবে না। এই মানুষটিকে আমি ভুলতে চাই না।

আমার মামারা ছাপোষা ধরনের মানুষ। মা'কে নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কন্যাসহ বোনের বোঝা মাথায় নেবার মত সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁদের ছিল না। তবু মা তাঁদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে রইলেন। কিছুদিন তিনি এক ভাইয়ের বাড়িতে থাকেন, তারপর যান অন্য ভাইয়ের বাসায়। মামারা ধরেই নিলেন মা তাঁর জীবনটা এভাবেই পার করবেন। তাঁরা মা'র সঙ্গে কুৎসিত গলায় ঝগড়া করেন। গালাগালি করেন। মা নির্বিকার। আমার বয়স যখন পাঁচ হল তখন আমাকে বললেন, 'রূপা, তোকে তো এখন একটা স্কুলে দিতে হয়। ঘুরে–ঘুরে জীবন পার করলে হবে না। আমাকে থিতু হতে হবে। আমি এখন একটা বাসা ভাড়া নেব। সম্ভব হলে একটা বাড়ি কিনে নেব।'

আমি বললাম, 'টাকা পাবে কোথায়?'

মা বললেন, 'টাকা আছে। তোর বাবার একটা পয়সাও খরচ করি নি, জমা করে রেখেছি।'

বাবা বিদেশি এক দূতাবাসে চাকরি করতেন। চাকরিকালীন সময়ে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান বলে ইন্সুরেন্স থেকে এবং দূতাবাস থেকে বেশ ভালো টাকাই পেয়েছিলেন। মা সেই টাকার অনেকখানি খরচ করে নয়াটোলায় দোতলা এক বাড়ি কিনে ফেললেন। বেশ বড় বাড়ি। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে বাড়ি। একতলা দোতলা মিলে অনেকগুলি ঘর। ভেতরের দিকে দুটো আমগাছ, একটা সজনেগাছ, একটা কাঁঠালগাছ। বাড়ি পুরনো হলেও সব মিলিয়ে খুব সুন্দর। একতলাটা পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া হল। আমরা থাকি দোতলায়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। মা সেই পাঁচিল আরো উঁচু করলেন। ভারি গেট করলেন। একজন দারোয়ান রাখলেন। আমাদের নতুন জীবন শুরু হল।

নতুন জীবন অনেক আনন্দময় হওয়া উচিত ছিল। মামাদের ঝগড়া–গালাগালি নেই। অভাব–অনটন নেই। এত বড় দোতলায় আমরা দু' জনমাত্র মানুষ। বাড়িটাও সুন্দর। দোতলায় রেলিং দেওয়া টানা–বারান্দাও আছে। আমার খেলার সঙ্গী–সাথীও আছে। একতলার ভাড়াটের আমার বয়সী দু'টি যমজ মেয়ে আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের নিজস্ব বাড়িতে আমার ভয়াবহ জীবন শুরু হল। মা সারাক্ষণ আমাকে আগলে রাখেন। নিজে স্কুলে নিয়ে যান, যে–চারঘন্টা স্কুল চলে মা মাঠে বসে থাকেন। ছুটি হলে আমাকে নিয়ে বাসায় ফেরেন। দুপুরে খাবার পরই আমাকে আমার ঘরে আটকে দেন। ঘুমুতে হবে। বিকেলে যদি বলি, 'মা, নিচে খেলতে যাই?'

তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, 'না। দোতলার বারান্দায় বসে খেল। খেলার জন্যে নিচে যেতে হবে কেন?'

'নিচে গেলে কী হবে মা?'

'তুমি নিচে গেলে আমি এখানে একা–একা কী করব?'

আসল কথা হচ্ছে মা'র নিঃসঙ্গতা। আমি তাঁর একমাত্র সঙ্গী। সেই সঙ্গী তিনি একমুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবেন না। দিনের পর দিন রাগারাগি করেছি, কান্নাকাটি করেছি, কোনো লাভ হয় নি।

কতবার বলেছি, 'মা, সবাই কত জায়গায় বেড়াতে যায়—চল আমরাও যাই। বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'চল কক্সবাজার যাই।'

'না।'

'তাহলে চল অন্য কোথাও যাই।'

'ঢাকার বাইরে যেতে আমার ইচ্ছা করে না।'

'ঢাকার ভেতরেই কোথাও যাই চল।'

'কোথায় যেতে চাস?'

'মামাদের বাড়ি।'

'না।'

'বাবার দেশের বাড়িতে যাবে মা? বড়চাচা তো লিখেছেন যেতে।'

'সেই চিঠি তুমি পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন পড়লে? আমি বলি নি—আমার কাছে লেখা কোনো চিঠি তুমি পড়বে না? বলেছি, না বলি নি?'

'বলেছ।'

'তাহলে কেন পড়েছ?'

'আর পড়ব না মা।'

'এইভাবে বললে হবে না। চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়াও। কানে ধর। কানে ধরে বল—আর পড়ব না।'

মা'র চরিত্রে অস্বাভাবিকতার বীজ আগে থেকেই ছিল। যত দিন যেতে লাগল তত তা বাড়তে লাগল। মানুষের মানিয়ে চলার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি মা'র সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে লাগলাম, এবং চলতেও লাগলাম। নিজের মনে থাকি। প্রচুর গল্পের বই পড়ি। মাঝে–মাঝে অসহ্য রাগ লাগে। সেই রাগ নিজের মধ্যে রাখি, মা'কে জানতে দিই না। আমার বয়স অল্প হলেও আমি ততদিনে বুঝে গিয়েছি—আমিই মা'র একমাত্র অবলম্বন। তাঁর সমস্ত জগৎ, সমস্ত পৃথিবী আমাকে নিয়েই।

মাঝে–মাঝে মা এমন সব অন্যায় করেন, যা ক্ষমার অযোগ্য। আমি সেই অপরাধও ক্ষমা করে দিই। একটা উদাহরণ দিই। আমি সেবার ক্লাস নাইনে উঠেছি। যারা এস· এস· সি· পরীক্ষা দেবে তাদের ফেয়ারওয়েল হচ্ছে। ফেয়ারওয়েলে নাটক করা হবে। আমাকে নাটকে একটা পার্ট দেওয়া হল। আমার উৎসাহের সীমা রইল না। মা'কে কিছুই জানালাম না। জানালে মা নাটক করতে দেবেন না। মা জেনে গেলেন। গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। আমি মা'কে সহজ করার অনেক চেষ্টা করলাম। মা সহজ হলেন না। যেদিন নাটক হবে তার আগের রাতে খাবার টেবিলে মা

প্রথমবারের মতো বললেন, 'তোমাদের নাটকের নাম কি?'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম—'হাসির নাটক মা। নাম হচ্ছে—দুই দু' গুণে পনের। দম-ফাটানো হাসির নাটক।'

'তোমার চরিত্রটা কী?'

'আমি হচ্ছি বড় বোন, পাগলাটে ধরনের মেয়ে। তাকে যে-কাজটি করতে বলা হয় সে সবসময় তার উল্টো কাজটি করে। তারপর খুব অবাক হয়ে বলে—Ohmy God, এটা কী করলাম! আমার অভিনয় খুব ভালো হচ্ছে মা। আমাদের বড়আপা গতকালই আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছেন—আমার ভেতর অভিনয়ের জন্মগত প্রতিভা আছে। চর্চা করলে আমি খুব নাম করব। মা, তুমি কি নাটকটা দেখবে?'

'না।'

'দেখতে চাইলে দেখতে পারবে। এই অনুষ্ঠানে গার্জিয়ানরা আসতে পারবেন না। তবে বড়আপা বলেছেন, যারা অভিনয় করছে তাদের মা'রা ইচ্ছে করলে আসতে পারবেন। তুমি যাবে মা? চল না। প্লীজ।'

মা শুকনো গলায় বললো, 'দেখি।'

'তুমি গেলে আমি অসম্ভব খুশি হব মা। অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব খুশি হব। এত খুশি হব যে চিৎকার করে কাঁদব।'

মা কিছু বললেন না। আমার মনে ক্ষীণ আশা হল মা হয়তো যাবেন। আনন্দে সারা রাত আমি ঘুমুতে পারলাম না। তন্দ্রামতো আসে আবার তন্দ্রা ভেঙে যায়। কী যে আনন্দ!

ভোরবেলা দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে দেখি দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'মা-মা-মা।'

মা এলেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তালাবন্ধ করে রেখেছ কেন মা?'

মা শীতল গলায় বললেন, 'আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম-তোমার অভিনয় করা ঠিক হবে না।'

'কী বলছ তুমি মা?'

'যা সত্যি তাই বলছি।'

'স্কুলে আপারা কী মনে করবে মা! আমি না-গেলে নাটক হবে না।'

'না-হলে না-হবে। নাটক এমন কিছু বড় জিনিস না।'

'পরে যখন স্কুলে যাব ওদের আমি কী বলব?'

'বলবি অসুখ হয়েছিল। মানুষের অসুখ হয় না?'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'ঠিক আছে মা—আমি স্কুলে যাব না। তুমি তালা খুলে দাও।'

'তালা সন্ধ্যার সময় খুলব।'

আমি যাচ্ছি না দেখে স্কুলের এক আপা আমাকে নিতে এলেন, মা তাঁকে বললেন, 'মেয়েটা অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। সে মামার বাড়িতে আছে।' একবার ভাবলাম চিৎকার করে বলি—আপা আমি বাড়িতেই আছি, মা আমাকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। পরমুহূর্তেই মনে হল—থাক।

মা তালা খুললেন সন্ধ্যাবেলায়। তাঁকে কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত মনে হল না।

শুধু রাতে আমার সঙ্গে ঘুমুতে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কান্না দেখে আমি মা'র অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।

আমি যখন ক্লাস টেনে উঠলাম তখন মা আরো একটি বড় ধরনের অপরাধ করলেন। আমাদের একতলায় তখন নতুন ভাড়াটে। তাদের বড় ছেলের নাম আবীর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। লাজুক স্বভাবের ছেলে। কখনো আমার দিকে চোখ তুলে তাকান না। যতবার আমার সঙ্গে দেখা হয় তিনি লজ্জায় লাল হয়ে যান। আমি ভেবে পাই না, আমাকে দেখে উনি এত লজ্জা পান কেন? আমি কী করেছি? আমি তো তাঁর সঙ্গে কথাও বলি না। তাঁর দিকে তাকাইও না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ছাদে গিয়েছি, দেখি, উনি ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন। আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, 'আমার বাবা আমাকে আপনাদের এই ছাদটা দেখতে পাঠিয়েছেন, এই জন্যে ছাদে এসেছি। অন্য কিছু না।'

আমি বললাম, 'ছাদ দেখতে পাঠিয়েছেন কেন?'

'আমার বড় বোনের মেয়ে হয়েছে। এই বাসায় ওর আকিকা হবে। বাবা বললেন—ছাদে প্যান্ডেল করে লোক–খাওয়াবেন, যদি ছাদটা বড় হয়।'

'ছাদটা কি বড়?'

'বড় না, তবে খুব সুন্দর। আমি যদি কিছুক্ষণ ছাদে থাকি আপনার মা কি রাগ করবেন?'

'না, রাগ করবেন কেন?'

'ওঁকে দেখলেই মনে হয় আমার উপর উনি খুব রাগ করে আছেন। আমার কেন জানি মনে হয়—উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না।'

আমি হাসতে–হাসতে বললাম, 'আপনি শুধু–শুধু ভয় পাচ্ছেন। মা শুধু আমার উপর রাগ করেন, আর কারো উপর রাগ করেন না।'

তিনি বললেন, 'আপনি যে এতক্ষণ ছাদে আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা জানতে পারলে আপনার মা খুব রাগ করবেন।'

'রাগ করবেন কেন? আর আপনি আমাকে আপনি–আপনি করছেন কেন? শুনতে বিশ্রী লাগছে। আমি আপনার ছোট বোন মীরার চেয়েও বয়সে ছোট। আমাকে তুমি করে বলবেন।'

মনে হল আমার কথা শুনে তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। আমার দারুণ মজা লাগল। উনি অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'আপনি কি ···· মানে তুমি কি রোজ ছাদে এসে চা খাও?'

'হ্যাঁ। হেঁটে–হেঁটে চা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। হেঁটে–হেঁটে চা খাই, আর নিজের সঙ্গে গল্প করি।'

'নিজের সঙ্গে গল্প কর মানে?'

'আমার তো গল্প করার কেউ নেই। এই জন্যে নিজের সঙ্গে গল্প করি। আমি একটা প্রশ্ন করি। আবার আমিই উত্তর দিই। আচ্ছা, আপনি চা খাবেন? আপনার জন্যে চা নিয়ে আসব?'

'না–না–না।'

'এ-রকম চমকে উঠে ''না-না'' করছেন কেন? আপনার জন্যে আলাদা করে চা বানাতে হবে না। মা একটা বড় টী-পটে চা বানিয়ে রেখে দেন। একটু পরপর চা খান। আমি সেখান থেকে ঢেলে এককাপ চা নিয়ে আসব। আপনি আমার মতো হাঁটতে-হাঁটতে চা খেয়ে দেখুন, আপনার ভালো লাগবে।'

'ইয়ে—তাহলে দু' কাপ চা আন। দু' জনে মিলেই খাই। তোমার মা জানতে পারলে আবার রাগ করবেন না তো?'

'না, রাগ করবেন না।'

আমি ট্রে-তে করে দু' কাপ চা নিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি—মা ডাকলেন, 'বুড়ি এদিকে আয়। কি ব্যাপার? চা কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস?'

আমি মা'র কথা বলার ভঙ্গিতে ভয়ানক চমকে উঠলাম। কী ভয়ংকর লাগছে মা'কে! হিংস্র কোনো পশুর মতো দেখাচ্ছে। তাঁর মুখে ফেনা জমে গেছে! চোখ টকটকে লাল।

'তুই কি আবীর ছেলেটির জন্যে চা নিয়ে যাচ্ছিস?

'হ্যাঁ।'

'এতক্ষণ কি ছাদে তার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'হুঁ।'

'ও কি তোর হাত ধরেছে?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'এ-সব কী বলছ মা!'

'হ্যাঁ কি না?'

'মা, আমি শুধু দু'-একটা কথা·····'

'শোন্ বুড়ি, তুই এখন আমার সঙ্গে নিচে যাবি। ঐ বদ ছেলের মা'কে তুই বলবি—আপনার ছেলে আমার গায়ে হাত দিয়েছে। আমি ঐ বদ ছেলেকে শিক্ষা দেব, তারপর বাড়ি থেকে তাড়াব। কাল দিনের মধ্যেই এই বদ পরিবারটাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে হবে।'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'এ-সব তুমি কী বলছ মা?'

মা হিসহিস করে বললেন, 'আমি যা বললাম তা যদি না করিস, আমি তোকে খুন করব। আল্লার কসম আমি তোকে খুন করব। আয় আমার সঙ্গে, আয় বললাম, আয়।'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে মা'র সঙ্গে নিচে গেলাম। মা আবীরের মা'কে কঠিন গলায় বললেন, 'আপনার ছেলে আমার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে। আপনার ছেলেকে ডেকে আনুন। এর বিচার করুন।'

ছেলের মা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আপা, আপনি এ-সব কী বলছেন? আমার ছেলে এ-রকম নয়। আপনি ভুল সন্দেহ করছেন। আবীর এমন নোংরা কাজ কখনো করবে না।'

'আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে আনুন। আমি তার সামনেই কথা বলব।'

উনি এসে দাঁড়ালেন। লজ্জায় ভয়ে বেচারা এতটুক হয়ে গেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মা আমাকে বললেন, 'বুড়ি বল্, বল্ তুই। এই বদ ছেলে কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে? সত্য কথা বল্। সত্য কথা না-বললে তোকে খুন করে ফেলব। বল্ এই ছেলে কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে?'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'বুকে হাত দিয়েছে কি না বল্। দিয়েছে বুকে হাত?'

'হ্যাঁ।'

মা কঠিন গলায় বললেন, 'আপনি নিজের কানে শুনলেন আমার মেয়ে কি বলল, এখন ছেলেকে শাস্তি দেবেন বা দেবেন না সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমার কথা হল আগামীকাল দুপুরের আগে আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।'

আমি এক পলকের জন্যে তাকালাম আবীর ভাইয়ের দিকে। তিনি পলকহীন চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সেই চোখে রাগ, ঘৃণা বা দুঃখ নেই; শুধুই বিস্ময়।

তাঁরা পরদিন দুপুরে সত্যি-সত্যি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। রাতে মা আমার সঙ্গে ঘুমুতে এসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে-মনে বললাম, 'মা, তোমাকে আমি ক্ষমা করতে চেষ্টা করছি, পারছি না। তুমি এমন করে কেঁদো না মা। আমার কষ্ট হচ্ছে। এমনিতেই অনেক কষ্ট পেয়েছি। আর কষ্ট দিও না।'

প্রথম পর্যায়ের লেখা এই পর্যন্তই। তারিখ দেওয়া আছে। সময় লেখা—রাত দু'টা পনের। সময়ের নিচে লেখা—একটানা অনেকক্ষণ লিখলাম। ঘুম পাচ্ছে। এখন ঘুমুতে যাব। মা আমার বিছানায় এসে শুয়েছেন। আজ সারা দিন হাঁপানিতে কষ্ট পেয়েছেন। এখন সম্ভবত হাঁপানিটা কমেছে। আরাম করে ঘুমুচ্ছেন। আজ সারা দিন মা'র নামাজ কাজা হয়েছে। ঘুম ভাঙলে কাজা নামাজ শুরু করবেন। রাত পার করে দেবেন নামাজে। কাজেই মা'র ঘুম না ভাঙিয়ে খুব সাবধানে বিছানায় যেতে হবে।

মিসির আলি তাঁর নোটবই বের করে পয়েন্ট নোট করতে বসলেন। পয়েন্ট একটিই—মেয়ের মা'র চরিত্রে যে-অস্বাভাবিকতা আছে তা মেয়ের মধ্যেও চলে এসেছে। মেয়ে নিজে তা জানে না। সে নিজেকে যতটা স্বাভাবিক ভাবছে তত স্বাভাবিক সে নয়। একটি স্বাভাবিক মেয়ে তার মৃত বাবার জন্যে অনেক বেশি ব্যস্ততা দেখাত। এত বড় একটি লেখার কোথাও সে বাবার নাম উল্লেখ করে নি। এমন না যে বাবার নাম তার অজানা। মা'র সম্পর্কে রূপবতী শব্দটি সে ব্যবহার করেছে—বাবা সম্পর্কে কিছুই বলে নি। তার মা, এত বড় একটা কাণ্ড করার পরেও মা'র কষ্টটাই তার কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে সে মা'র কাছ থেকে আলাদা করতে পারছে না। এর ফলাফল সাধারণত শুভ হয় না। এত বড় ঘটনার পরেও যে মা'র কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারছে না—সে আর কোনোদিনও পারবে না।

মিসির আলি রূপার খাতার পাতা ওল্টালেন।

## ৬

এস. এস.সি.-তে আমার এত ভালো রেজাল্ট হবে আমি কল্পনাও করি নি। আমাদের ক্লাসের অন্য সব মেয়েদের প্রাইভেট টিউটর ছিল, আমার ছিল না। মা'র পছন্দ নয়। মা'র ধারণা, অল্পবয়স্ক প্রাইভেট মাস্টাররা ছাত্রীর সাথে প্রেম করার চেষ্টা

করে, বয়স্করা নানান কৌশলে গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই যা পড়লাম, নিজে–নিজে পড়লাম। রেজাল্ট হবার পর বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য কাণ্ড, ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফিফ্‌থ্। পাঁচটা বিষয়ে লেটার।

আমি বললাম, 'তুমি কি খুশি হয়েছ মা?'

মা যন্ত্রের মতো বললেন, 'হুঁ।'

'খুব খুশি না অল্প খুশি?'

'খুব খুশি।'

'আমাদের সঙ্গে যে, মেয়েটা ফোর্থ হয়েছে সে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাচ্ছে। তুমি কি আমাকে শান্তিনিকেতনে পড়তে দেবে?'

মা আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, দেব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। কীভাবে যেতে হয়, টাকাপয়সা কত লাগে খোঁজখবর আন্।'

'তুমি সত্যি–সত্যি বলছ তো মা?'

'বললাম তো—হ্যাঁ।'

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস না হবার কী আছে? এই দেশে কি আর পড়াশোনা আছে? টাকা থাকলে তোকে বিলেতে রেখে পড়াতাম।'

আমার আনন্দের সীমা রইল না। ছোটাছুটি করে কাগজপত্র জোগাড় করলাম। অনেক যন্ত্রণা! সরকারি অনুমতি লাগে। আরো কি কি সব যন্ত্রণা। সব করলেন রুমার বাবা। রুমা হচ্ছে সেই মেয়ে, যে ফোর্থ হয়েছে। রুমার বাবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। তিনি যে শুধু ব্যবস্থা করে দিলেন তাই না, আমাদের দু' জনের জন্যে দুটো স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। পাসপোর্ট–ভিসা সব উনি করলেন। বাংলাদেশ বিমানে যাব, সকাল ৯টায় ফ্লাইট। উত্তেজনায় আমি রাতে ঘুমুতে পারলাম না। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে সারা রাতই ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। খানিকক্ষণ কাঁদেন, তারপর বলেন, 'ও বুড়ি, তুই কি পারবি আমাকে ছেড়ে থাকতে?'

'কষ্ট হবে, তবে পারব। তুমিও পারবে।'

'না—আমি পারব না।'

'যখন খুব কষ্ট হবে তখন কোলকাতা চলে যাবে। কোলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন দেড় ঘন্টা লাগে ট্রেনে। শান্তিনিকেতনে অতিথি ভবন আছে, সেখানে উঠবে। আমার যখন খারাপ লাগবে, আমিও তাই করব, হুট করে ঢাকায় চলে আসব।'

'তুই বদলে যাচ্ছিস।'

'আমি আগের মতোই আছি মা। সারা জীবন এই রকমই থাকব।'

'না, তুই বদলাবি। তুই ভয়ংকর রকম বদলে যাবি। আমি বুঝতে পারছি।'

'তোমার যদি বেশি রকম খারাপ লাগে তাহলে আমি শান্তিনিকেতনে যাবার আইডিয়া বাদ দেব।'

'বাদ দিতে হবে না। তোর এত শখ, তুই যা।'

'মা শোন যাবার পর যদি দেখি খুব খারাপ লাগছে তাহলে চলে আসব।'

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙল। দেখি মা বিছানায় নেই। দরজা খুলতে গিয়ে দেখি বাইরে থেকে তালাবন্ধ। আমি আগের বারের মতো হৈচৈ-চেঁচামেচি করলাম না, কাঁদলাম না—চুপ করে রইলাম। তালাবন্ধ রইলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা মা নিচু গলায় বললেন, 'ভাত খেতে আয় বুড়ি। ভাত দিয়েছি।'

আমি শান্ত মুখে ভাত খেতে বসলাম। এমন ভাব করলাম যেন কিছুই হয় নি। মা বললেন, 'ডালটা কি টক হয়ে গেছে? সকালে রান্না করেছিলাম, দুপুরে জ্বাল দিতে ভুলে গেছি।'

আমি বললাম, 'টক হয় নি। ডাল খেতে ভালো হয়েছে মা।'

'ভাত খাবার পর কি চা খাবি? চা বানাব?'

'বানাও।'

আমি চা খেলাম। খবরের কাগজ পড়লাম। ছাদে হাঁটতে গেলাম। মা যখন এশার নামাজ পড়তে জায়নামাজে দাঁড়ালেন, তখন আমি এক অসীম সাহসী কাণ্ড করে বসলাম। বাড়ি থেকে পালালাম। রাত ন'টায় উপস্থিত হলাম এষার বাসায়। এষা আমার বান্ধবী। এষার বাবা-মা খুবই অবাক হলেন। তাঁরা তক্ষুণি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে চান। অনেক কষ্টে তাঁদের আটকালাম। একরাত তার বাসায় থেকে, ভোরবেলা চলে গেলাম রুবিনাদের বাড়ি। রুবিনাকে বললাম, 'আমি দু' দিন তোদের বাড়িতে থাকব। তোর কি অসুবিধা হবে? আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

রুবিনা চোখ কপালে তুলে ফেলল। আমি বললাম, 'তুই তোর বাবা-মা'কে কিছু একটা বল্, যাতে তাঁরা সন্দেহ না করেন যে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

রুবিনাদের বাড়িতে দু' দিনের জায়গায় আমি চার দিন কাটিয়ে পঞ্চম দিনের দিন মা'র কাছে ফিরে যাওয়া স্থির করলাম। বাড়ি পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। মা আমাকে দেখলেন, কিছুই বললেন না। এ-রকমভাবে তাকালেন যেন কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি। আমি চাপা গলায় বললাম, 'কেমন আছ মা?'

মা বললেন, 'ভালো।'

'তুমি মনে হয় আমার উপর ভয়ংকর রাগ করেছ। কি শাস্তি দিতে চাও—দাও। আমি ভয়ংকর অন্যায় করেছি। শাস্তি আমার প্রাপ্য।'

মা কিছু বললেন না। রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। আমি লক্ষ করলাম, বসার ঘরে অল্পবয়সী একটি ছেলে বসে আছে। কঠিন ধরনের চেহারা। রোগা, গলাটা হাঁসের মতো অনেকখানি লম্বা। মাথার চুল তেলে জবজব করছে। সে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে একনজর দেখে আবার খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

আমি মা'কে গিয়ে বললাম, 'বসার ঘরে বসে আছে লোকটা কে?'

'ওর নাম জয়নাল। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ইনজিনিয়ারিং পড়ে। ফাইনাল ইয়ারে। এ-বছর পাশ করে বেরুবে।'

'এখানে কী জন্যে?'

'তুই চলে যাবার পর আমি খবর দিয়ে আনিয়েছি। একা থাকতাম। ভয়ভয় লাগত।'

'আই এম সরি মা। এ-রকম ভুল আর করব না। আমি চলে এসেছি, এখন তুমি

‘তুই আমার ঘরে আয় বুড়ি। তোর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।’
আমি মা’র ঘরে গেলাম। মা দরজা বন্ধ করে দিলেন। মা’র দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। এতক্ষণ লক্ষই করিনি এই পাঁচদিনে মা’র চেহারা, স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে একটা জীবন্ত কঙ্কাল। মা বললেন, তুই চলে যাবার পর থেকে আমি পানি ছাড়া আর কিছু খাইনি। এটা কি তোর বিশ্বাস হয়?
আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, হয়।
মা বললেন, দোকান থেকে ইঁদুর-মারা বিষ এনে আমি গ্লাসে গুলে রেখেছি – তোর সামনে খাব বলে। আমি যে তোর সামনে বিষ খেতে পারি এটা কি তোর বিশ্বাস হয়?
আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, হয়।
মা বললেন, এক শর্তে আমি বিষ খাব না। আমি যে-ছেলেটিকে বসিয়ে রেখেছি তাকে তুই বিয়ে করবি। এবং আজ রাতেই করবি। আমি কাজি ডাকিয়ে আনব।
আমি বললাম, এসব তুমি কী বলছ মা!
‘এই ছেলে খুব গরিব ঘরের ছেলে। ভাল ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। আমি তাকে ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়ার খরচ দিয়ে যাচ্ছি। তোর জন্যেই করছিলাম। এই ছেলে বিয়ের পর এ-বাড়িতে থাকবে, আমাদের দুজনকে দেখাশোনা করবে।
আমার মুখে কথা আটকে গেল। মাথা ঘুরছে। কী বলব কিছুই বুজতে পারছি না। মা বললেন, টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখ – গ্লাসে বিষ গোলা আছে। এখন মন ঠিক কর। তারপর আমাকে বল।

সেই রাতেই আমার বিয়ে হল। নয়াটোলার কাজিসাহেব বিয়ে পড়িয়ে দিয়ে গেলেন। দেনমোহরানা এক লক্ষ টাকা। বিয়ে উপলক্ষে দামি একটা বেনারসি পড়লাম। মা আগেই কিনিয়ে রেখেছিলেন।
বাসর হল মা'র শোবার ঘরে।
আমার স্বামী বাসররাতে প্রথম যে-কথাটি আমাকে বললেন, তা হচ্ছে- গত পাঁচদিন তুমি কার কার বাড়িতে ছিলে আমাকে বলো। আমি খোঁজ নেব।
আমি কঠিন গলায় বললাম, কী খোঁজ নেবেন?
আমার স্বামী বললেন, গরিব হয়ে জন্মেছি বলে আজ আমার এই অবস্থা – বড়লোকের নষ্ট মেয়ে বিয়ে করতে হল। নষ্টামি যা করেছ করেছ। আর না। আমি মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু ধানি মরিচ। ধানি মরিচ চেন তো? সাইজে ছোট – ঝাল বেশি।

আমার ধারণা শরীর থেকেই ভালবাসার জন্ম হতে পারে। আমি আমার স্বামীকে ভালবাসলাম। আমার ধারণা, এই ভালবাসার উৎস শরীর। মানুষের মন যেমন বিচিত্র, তার শরীরও তেমনি।
আমি এবং আমার মা, আমরা দুজনই ছিলাম নিঃসঙ্গ। তৃতীয় ব্যক্তি এসে আমাদের এই নিঃসঙ্গতা দূর করল। বাড়ির একতালাটা মা আমাদের দুজনকে ছেড়ে

দিলেন। মা'র সঙ্গে থেকেও তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকার স্বাদ খানিকটা হলেও পাওয়া গেল। আমরা একসঙ্গে খাবার খেতাম। তখন আমার স্বামী মজার–মজার কথা বলে আমাদের খুব হাসাতেন। আমার মা'কে তিনি বেশ পছন্দ করতেন। আমরা হয়তো খেতে বসলাম, তিনি আমার মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আম্মা, আপনাকে এমন মনমরা লাগছে কেন? তাহলে শোনেন একটা মজার গল্প—মন ভালো করে দেবে। আমাদের দেশের বাড়িতে সফদরগঞ্জ বাজারে এক দর্জি থাকত। এক ঈদে সে তিনটা হাতা দিয়ে এক পাঞ্জাবি বানাল . . . . .

গল্প এই পর্যন্ত শুনেই মা হাসতে–হাসতে ভেঙে পড়লেন। মা হাসছেন, আমি হাসছি আর উনি মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন—কখন আমরা হাসি থামাব সেই অপেক্ষা।

ঘর–জামাইদের নানান রকম ত্রুটি থাকে। তারা সারাক্ষণ শ্বশুরবাড়ির টাকাপয়সা সম্পর্কে খোঁজখবর করে। তাদের চেষ্টাই থাকে কী করে সব– কিছুর দখল নেওয়া যায়। আমার স্বামী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনো এ–সব নিয়ে মাথা ঘামান নি। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাতদিন পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। অবসর সময়টা মা'কে গল্প শোনাতে পছন্দ করতেন। আমাকে গল্প শোনানোর ব্যাপারে তিনি তেমন আগ্রহ বোধ করতেন না। আমার শরীর তিনি যতটা পছন্দ করতেন, আমাকে ততটা করতেন না।

বিয়ের দু' মাস যেতেই আমার ধারণা হল সম্ভবত আমি 'কনসিভ' করেছি। পুরোপুরি নিশ্চিতও হতে পারছি না। একই সঙ্গে ভয় এবং আনন্দে আমি অভিভূত।

এক রাতে স্বামীকে বললাম। তিনি সরু চোখে দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পেটে বাচ্চা?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'বয়স কত বাচ্চার?'

'জানি না। আমি কী করে জানব? ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল, ডাক্তার দেখে বলুক।'

'ডাক্তারের কাছে নিতে হবে না। বাচ্চা কখন এসেছে সেটা তুমিই জান। ঐ যে পাঁচ রাত ছিলে অন্য জায়গায়, ঘটনা তখন ঘটে গেছে।'

'কী বলছ তুমি!'

'এ–রকম চমকে উঠবে না। চমকে ওঠার খেলা আমার সাথে খেলবে না। তোমার পেটে অন্য মানুষের সন্তান।'

আমি হতভম্ব।

আমার স্বামী কুৎসিততম কথা ক'টি বলে বাতি নিভিয়ে শুতে এলেন এবং অন্যসব রাতের মতোই শারীরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন। ঘৃণায় আমি পাথর হয়ে গেলাম।

আমি বললাম, 'আমার শান্তির দরকার নেই। অশান্তিই ভালো।' মানসিক আঘাতে --আঘাতে আমি বিপর্যস্ত। একদিন ইচ্ছে করেই আমার স্বামী আমার পেটে লাথি বসালেন এই আশায় যেন গর্ভপাত হয়ে যায়। আমি দু'হাতে পেটে চেপে বসে পড়তেই তিনি গভীর আগ্রহে বললেন, 'কি, যন্ত্রণা খালাস হয়ে গেছে?' রাতে আমি ঘুমুতে

ভঙ্গিতে। দিনের কোনোকিছুই তখন তাঁর মনে থাকে না।

আমার স্বামী আমাকে বললেন, 'বাচ্চাটিকে তুমি নষ্ট করে ফেল। যদি নষ্ট করে ফেল, তাহলে আমি আর কিছু মনে পুষে রাখব না। সব ভুলে যাব। সব চলবে আগের মতো। তুমি মেয়ে খারাপ না।'

আমি বললাম, 'বাচ্চা আমি নষ্ট করব না। এই বাচ্চা তোমার।'

'চুপ থাক। নষ্ট মেয়েছেলে।

'তুমি দয়া করে আমাকে বিশ্বাস কর।'

'চুপ—চুপ। চুপ বললাম—পাঁচ রাত বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরেছ। রাতে কী মচ্ছব হয়েছিল আমি জানি না? ঠিকই জানি। আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'তুমি কোনো খোঁজ নাও নি।'

'চুপ। চুপ বললাম।'

আমি দিনরাত কাঁদি। আমার মা-ও দিনরাত কাঁদেন। এক পর্যায়ে মা আমাকে বলতে বাধ্য হলেন—'বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেল'ই ভালো। বাচ্চাটা তুই নষ্ট করে ফেল। সংসারে শান্তি আসুক।'

আমি বললাম, 'আমার শান্তির দরকার নেই। অশান্তিই ভালো।

মানসিক আঘাতে-আঘাতে আমি বিপর্যস্ত। একদিন ইচ্ছে করেই আমার স্বামী আমার পেটে লাথি বসালেন এই আশায় যেন গর্ভপাত হয়ে যায়। আমি দু'হাতে পেটে চেপে বসে পড়তেই তিনি গভীর আগ্রহে বললেন, 'কি, যন্ত্রণা খালাস হয়ে গেছে?'

রাতে আমি ঘুমুতে পারি না। দিনে খেতে পারি না। ভয়ংকর অবস্থা। আমার পেটের সন্তানটির বৃদ্ধিও ব্যাহত হচ্ছে। ডাক্তার প্রতিবারই পরীক্ষা করে বলেন'—বেবির গ্রোথ তো ঠিকমতো হচ্ছে না। সমস্যা কী? আরো ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করবেন। প্রচুর বিশ্রাম করবেন। দৈনিক দু' গ্লাস করে দুধ খাবেন। আন্ডার ওয়েট বেবি হলে খুব সমস্যা। এই দেশে বেশির ভাগ শিশুমৃত্যু হয় আন্ডারওয়েটের জন্য।'

আমার সন্তানের যখন ছ' মাস তখন ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটল। আমার স্বামী এক সকালে চায়ের টেবিলে শান্তমুখে ঘোষণা করলেন—'আমি আজ এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনারা আমার কথা শোনেন নি। সন্তানটাকে নষ্ট করতে রাজি হন নি। কাজেই আমি বিদায়। তবে আরেকটা কথা—যদি সন্তানটা মৃত হয়, মৃত হবারই কথা, তাহলে আমি আবার ফিরে আসব। অতীতে যা ঘটেছে তা মনে রাখব না। রূপা মেয়ে খারাপ না। পাকেচক্রে তার পেটে অন্য পুরুষের সন্তান এসে গেছে। আমি সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। সন্তান মৃত হলে সব চলবে আগের মতো।'

আমার মা কঠিন গলায় বললেন, 'সন্তান মৃত হওয়ার কথা তুমি বললে কেন? এই কথা কেন বললে?'

'বললাম, কারণ আমি জানি সন্তান মৃত হবে। আমি.... আমি.....'

'তুমি কি?'

আমার স্বামী আর কিছু বললেন না। মা'র অনুরোধ, কান্নাকাটি, আমার কান্না কিছুতেই কিছু হল না, তিনি চলে গেলেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড জ্বর, গায়ে চাকা-চাকা কি-সব বেরুল, মাথার চুল পড়ে গেল। ভয়ংকর- ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। সেই সময়ের সবচেয়ে কমন স্বপ্ন ছিল—আমি একটা ঘরে বন্দি হয়ে

আছি। ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। সাদা দেয়াল। হঠাৎ সেই সাদা দেয়াল ফুঁড়ে একটা কালো লম্বা হাত বের হয়ে এল। হাত না, যেন একটা সাপ। সাপের মাথা যেখানে থাকে সেখানে মাথার বদলে মানুষের আঙুলের মতো আঙুল। হাতটা আমাকে পেঁচিয়ে ধরল। ঠাণ্ডা কুৎসিত তার স্পর্শ। ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, সারা শরীর ঘামে চটচট করছে। বাকি রাতটা জেগে থাকার চেষ্টা করি। আবার একসময় তন্দ্রার মতো আসে। সেই একই স্বপ্ন দেখি, চিৎকার করে জেগে উঠি।

বাচ্চার ন' মাসের সময় ডাক্তার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'বাচ্চার সাইজ অত্যন্ত ছোট, মুভমেন্ট কম। আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। মনে হচ্ছে বাচ্চা যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছে না।'

হাসপাতালে ভর্তি হলাম। দুর্বল, অপুষ্ট একটি শিশুর জন্ম দিলাম। নিজেও খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাচ্চাকে রাখা হল ইনকিউবিটরে। অসুস্থ অবস্থায় একদিন দেখি দরজার কাছে আমার স্বামী দাঁড়িয়ে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বললাম, 'ভেতরে এস।'

সে হিসহিস করে বলল, 'বিষের পুঁটলিটা কই? এখনো বেঁচে আছে? এখনো বেঁচে আছে কেন তা তো বুঝলাম না তার তো মরে যাওয়া উচিত ছিল। আমি দরগায় মানত করেছি। এমন দরগা, যেখানে মানত মিস হয় না।'

আমি আঁৎকে উঠলাম। সে ঘরে ঢুকল না, খানিকক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। আমি মা'কে বললাম, 'কিছুতেই আমি হাসপাতালে থাকব না। কিছুতেই না। হাসপাতালে থাকলেই সে এসে কোনো-না-কোনোভাবে বাচ্চার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।'

মা বললেন, 'তোর এই অবস্থায় হাসপাতাল ছাড়া ঠিক হবে না। বাচ্চা খানিকটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু তোর অবস্থা খুব খারাপ। বাড়িতে নিয়ে গেলে তুই মরে যাবি।'

'মরে গেলেও আমি বাড়িতেই যাব। এখানে থাকব না।'

'ডাক্তার তোকে ছাড়বে না।'

'ডাক্তারকে তুমি ডেকে আন মা। আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরব।'

ডাক্তার আমাকে ছাড়লেন। বাচ্চা নিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম। দারোয়ানকে বলে দিলাম, দিনরাত যেন গেট বন্ধ থাকে। কাউকেই যেন ঢুকতে দেওয়া না-হয়। কাউকেই না।

আমার শরীর খুবই খারাপ হল। একরাতের কথা—ঘুমুচ্ছি। মা ঘরে ঢুকে বললেন, 'বাচ্চাটা যেন কেমন করছে।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল। আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'কেমন করছে মানে কী মা?'

'মনে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

'তুমি বসে আছ কেন? তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

'অ্যাম্বুলেন্স খবর দিয়েছি।'

'অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করবে, তুমি বেবিট্যাক্সি করে যাও।'

এমন সময় বাচ্চা দুর্বল গলায় কেঁদে উঠল। মা ছুটে পাশের ঘরে গেলেন। পরক্ষণেই আমার ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর মুখ সাদা। হাত-পা কাঁপছে। আমি চিৎকার

করে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরল চারদিন পর হাসপাতালে। আমি বললাম, 'আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা?'

মা পাথরের মতো মুখ করে রইলেন। আমি আবার জ্ঞান হারালাম।

আমার বাচ্চার কবর হল আমাদের বাড়ির পিছনে। আম গাছের নিচে। ছোট্ট একটা কবর ছাড়া বাড়িতে কোনো রকম পরিবর্তন হল না। সবকিছু চলতে লাগল আগের মতো। আমার স্বামী ফিরে এলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আই অ্যাম সরি। সময়ের সঙ্গে–সঙ্গে তুমি শোক কাটিয়ে উঠবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম শোক কাটিয়ে উঠতে।

প্রবল শোক একবার আসে না। দু' বার করে আসে। তাই নাকি নিয়ম। অন্যের কথা জানি না, আমার বেলায় নিয়ম বহাল রইল। চার মাসের মাথায় মা মারা গেলেন। মা শেষের দিকে খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের ঘরে দরজা–জানালা বন্ধ করে বসে থাকতেন। মৃত্যুর দু' দিন আগে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে তোর কি কোনো অভিযোগ আছে?'

আমি বললাম, 'না।'

'আমার গায়ে হাত দিয়ে স্পষ্ট করে বল।'

আমি মায়ের গায়ে হাত দিয়ে স্পষ্ট করে বললাম, 'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ—সত্যি। শুধু খানিকটা অভিমান আছে।'

'অভিমান কেন?'

'তোমার জামাই যেমন মনে করে, আমার ছেলের বাবা সে নয়—তুমিও তাই মনে কর।'

মা চমকে উঠে বললেন, 'এই কথা কেন বলছিস?'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'তুমি রাতদিন এত নামাজ পড়—রোজা রাখ। কিন্তু কখনো তুমি আমার ছেলের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে একটু দোয়া পড় নি। তার থেকেই এই ধারণা হয়েছে। বিশ্বাস কর মা, আমি ভালো মেয়ে।'

মা কাঁদতে–কাঁদতে বললেন, 'ঐ কবরটা আমি সহ্য করতে পারি না বলে কাছে যাই না। দূর থেকে দোয়া পড়ি মা। দিনরাতই আল্লাহ্‌কে ডেকে তোর ছেলের মঙ্গল কামনা করি।'

মা মারা গেলেন।

যতটা কষ্ট পাব ভেবেছিলাম ততটা পেলাম না। বরং নিজেকে একটু যেন মুক্ত মনে হল। অতি সূক্ষ্ম হলেও স্বাধীনতার আনন্দ পেলাম। মনের এই বিচিত্র অবস্থার জন্যে লজ্জাও পেলাম।

মা'র মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যে আমার মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। সন্ধ্যা হয়–হয় করছে। হঠাৎ শুনলাম আমার বাচ্চাটা কাঁদছে। ওঁয়া–ওঁয়া করে কান্না। এটা যে আমার বাচ্চার কান্না তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

এ–রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল। রাতে ঘুমুতে যাচ্ছি—বাতি নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকছি—অমনি আমার সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল। আমি শুনলাম, আমার বাচ্চা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। আমি ছুটে গেলাম কবরের কাছে। আমার স্বামী এলেন পিছনে, পিছনে। তিনি ভীত গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'কিছু না।'

'কিছু না, তাহলে দৌড়ে চিৎকার করে নিচে নেমে এলে কেন?'

'এমনি এসেছি। কোনো কারণ নেই।'

'তোমার মাথাটা আসলে খারাপ হয়ে গেছে রূপা।'

'বোধহয় হয়েছে।'

'ভালো কোনো ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও।'

'আচ্ছা করাব। এখন তুমি আমার সামনে থেকে যাও। আমি এখানে একা– একা খানিকক্ষণ বসে থাকব।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছা করছে, তাই।'

'এখন বৃষ্টি হচ্ছে। তুমি অকারণে বৃষ্টিতে ভিজবে?'

'হ্যাঁ।'

'একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে তোমার দেখা করা দরকার।'

'দেখা করব। এখন তুমি যাও।'

সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গেও দেখা করলাম। কাউকে জানালাম না, একা–একা গেলাম। সাইকিয়াট্রিস্ট বেশ বয়স্ক মানুষ। মাথার চুল ধবধবে সাদা। হাসিখুশি মানুষ। তিনি চোখ বন্ধ করে আমার সব কথা শুনলেন। কেউ চোখ বন্ধ করে কথা শুনলে আমার ভালো লাগে না। মনে হয় কথা শুনছেন না। এঁর বেলা সে–রকম মনে হল না। আমি যা বলার সব বললাম। তিনি চোখ মেলে হাসলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার হাসি। যে–হাসি বলে দেয়—আপনার কিছুই হয় নি। কেন এমন করছেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, 'কফি খাবেন?'

আমি বললাম, 'না।'

'খান—কফি খান। কফি খেতে–খেতে আমরা কথা বলি।'

'বেশ, কফি দিতে বলুন।'

কফি চলে এল। তিনি বললেন, 'আপনার ধারণা, আপনি আপনার ছেলের কান্না শুনতে পান?'

'ধারণা না। আমি সত্যি–সত্যি শুনতে পাই।'

'আপনি কান্না শুনতে পান, তার মানে এই না যে, আপনার ছেলেরই কান্না। ছোট বাচ্চাদের কান্না একরকম।'

'আমি আমার ছেলের কান্নাই শুনতে পাই।'

'আচ্ছা বেশ। সবসময় শুনতে পান, না মাঝে–মাঝে পান?'

'মাঝে–মাঝে পাই।'

'আগে থেকে কি বুঝতে পারেন যে এখন কান্না শুনবেন?'

'তার মানে কী?'

'গা শিরশির করে, কিংবা মাথা ধরে।—যার পরপর কথা শোনা যায়।'

'না—তেমন কিছু না।'

'আপনার মা মারা গিয়েছেন–তাঁর কথা কি শুনতে পান?'

'না।'

'ছোটবেলায় এমন কিছু কি হত? অর্থাৎ এ–রকম কান্না বা শব্দ শুনতে পেতেন?'

'না।'

'আপনার সমস্যাটা তেমন জটিল নয়। আপনার ছেলের মৃত্যুজনিত আঘাতে এটা হয়েছে। আঘাত ছিল তীব্র। এতে মস্তিষ্কের ইকুইলিব্রিয়াম খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। আপনার কোলে আরেকটা শিশু এলে সমস্যা কেটে যাবে। আপনার যা হয়েছে তা হল জীবনের দুঃখজনক স্মৃতি মনে অবদমিত অবস্থায় আছে। আপনি চলে গেছেন Anxiety state–এ, সেখান থেকে নিউরাসথেনিয়া . . . .'

'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার দরকার নেই। এমন কিছু করুন যেন নিজে ব্যস্ত থাকেন। ঘুমের অষুধ দিচ্ছি। রাতে ঘুমুবার সময় খাবেন, যাতে ঘুমটা ভালো হয়। যখন আবার কান্নার শব্দ শুনবেন তখন দৌড়ে কবরের কাছে যাবেন না, কারণ কান্নার শব্দ কবর থেকে আসছে না। শব্দ তৈরি হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কে। আপনি নিজেকেই নিজে বোঝাবেন। মনে–মনে বলবেন, এ–সব কিছু না। এ–সব কিছু না। বাড়িটাও ছেড়ে দিন। ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

ডাক্তার সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে বেবিট্যাক্সি নিয়েছি, ঠিক তখন স্পষ্ট আবার কান্নার শব্দ শুনলাম। আমার বাচ্চাটিই যে কাঁদছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি মনে–মনে বললাম, আমি কিছু শুনছি না। আমি কিছু শুনছি না। তাতে লাভ হল না। সারা পথ আমি আমার বাচ্চার কান্না শুনতে–শুনতে বাড়িতে এলাম।

আমার স্বামী খুব ভালোভাবে পাশ করলেন। ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং–এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর একটা চাকরি হল। আমরা আমাদের বাড়ি ছেড়ে কলাবাগানে দু'–কামরার ছোট একটা ঘর ভাড়া নিলাম। আমি সংসারে মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রচুর কাজ এবং প্রচুর অকাজ করি। রান্নাবান্না করি। সেলাইয়ের কাজ করি। আচার বানানোর চেষ্টা করি। যে–ঘর একবার মোছা হয়েছে সেই ঘর আবার ভেজা ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে দিই। কাজের একটি মেয়ে ছিল, তাকেও ছাড়িয়ে দিলাম। কারণ একটাই—আমি যাতে ব্যস্ত থাকতে পারি।

সারা দিন ব্যস্ততায় কাটে। রাতের বেলায়ও আমার স্বামী আমাকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখেন। শারীরিক ভালবাসার উন্মাদনা এখন আমার নেই—তবু ভান করি যেন প্রবল আনন্দে সময় কাটছে। আসলে কাটে না। হঠাৎ–হঠাৎ আমি আমার বাচ্চার কান্না শুনতে পাই। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসে।

আমার স্বামী বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী হল? এ–রকম করছ কেন?'

আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করি। তিনি তিক্ত গলায় বলেন, 'এইসব ঢং কবে বন্ধ করবে? আর তো সহ্য হয় না। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।'

আমি কাঁদতে শুরু করি। তিনি কুৎসিত গলায় বলেন—'বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কাঁদ। সামনে না। খবরদার, চোখের সামনে কাঁদবে না।'

ভাড়া-বাসায় বেশিদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমি প্রায় জোর করেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলাম। যে-বাড়িতে আমার ছোট্ট বাবার কবর আছে সেই বাড়ি ছেড়ে আমি কী করে দূরে থাকব!

নিজের বাড়িতে ফেরার পরপর আলস্য আমাকে জড়িয়ে ধরল। কোনো কাজেই মন বসে না। আমি বেশির ভাগ সময় বসে থাকি আমার বাবুর কবরের পাশে। দোতলার সিঁড়ি থেকে ক্রুদ্ধ চোখে আমাকে দেখেন আমার স্বামী। তাঁর চোখে রাগ ছাড়াও আর যা থাকে, তার নাম ঘৃণা।

## ৭

মাথার যন্ত্রণা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে মিসির আলি তাঁর নোটবই লিখে ভরিয়ে ফেলছেন। রূপার লেখা বারবার করে পড়ছেন। স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েটির এই ভয়াবহ সমস্যায় স্বামীর অংশ কতটুকু তা বের করা দরকার।

রূপার পুরো লেখাটা স্বামীর প্রতি ঘৃণা নিয়ে লেখা ; তার পরেও বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি তার স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছে। সাইকিয়াট্রিস্টের কথামতো আলাদা বাসা ভাড়া করেছে।

মিসির আলি তাঁর নোটবইতে লিখলেন—আমাকে ধরে নিতে হবে মেয়েটি মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ নয়। সে পৃথিবীকে তার অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে দেখছে এবং বিচার করছে। স্বামীকেও সে একইভাবে দেখছে। সে তার স্বামীর ছবি যে-ভাবে এঁকেছে তাতে তাকে ঘৃণ্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে, অথচ এই মেয়ে তার মা'র ছবি এঁকেছে গভীর মমতায়। মা'র ছবি এত মমতায় আঁকা সত্ত্বেও মা'র ভয়াবহ রূপ বের হয়ে এসেছে। আমার কাছে জয়নাল ছেলেটিকে হৃদয়বান ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। এই ছেলে দু' জন নিঃসঙ্গ মহিলাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে হাসির গল্প করে। তাদের হাসাতে চেষ্টা করে। ছেলেটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—তার স্ত্রীর সন্তানটি তার নয়। তার পরেও সে স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে। ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। এবং বলছে মেয়েটা ভালো।

রূপা শিশুর কান্না শুনছে। এটা কেন হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। মিসির আলি নোটবইতে কবে-কবে কান্না শোনা গেল তা লিখে রাখতে শুরু করলেন। এর থেকে যদি কিছু বের হয়ে আসে।

'স্যার, ট্রেইন দেইখ্যা আসছি।'

মিসির আলি লেখা থামিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কি দেখে এসেছ?'

'ট্রেইন। রেলগাড়ি। আপনে বললেন রেলগাড়ি দেখতে। চলন্ত রেলগাড়ি কী রঙে দেখা যায় দেখতে কইলেন। দেখলাম।'

'কি দেখলে? কালো দেখা যায়?'

BDeBooks.Com

'জ্বি—না, সবুজ দেখা যায়। সবুজ জিনিস, চলন্ত অবস্থায় যেমন সবুজ, থামন্ত অবস্থায়ও সবুজ। এইটা হইল আপনার সাধারণ কথা।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে বললেন, 'সাধারণ ব্যাপারেও মাঝে-মাঝে কিছু অসাধারণ জিনিস থাকে বজলু। সেই অসাধারণ জিনিস খুঁজে বের করতে আমার ভালো লাগে। সারা জীবন তাই খুঁজেছি। কখনো পেয়েছি কখনো পাইনি। চলন্ত ট্রেন তোমাকে দেখতে বললাম কেন জান?'

'জ্বি না।'

'আমি লক্ষ করেছি উড়ন্ত টিয়া পাখি কালো দেখা যায়। সবুজ রঙ গতির কারণে কালো হয়ে যায় কি না, সেটাই আমার দেখার ইচ্ছা ছিল।'

'উড়ন্ত টিয়া পাখি কালো দেখা যায়, জানতাম না স্যার।'

'আমিও জানতাম না। দেখে অবাক হয়েছি। আচ্ছা বজলু তুমি যাও, আমি এখন জরুরি একটা কাজ করছি। একটি মেয়ের সমস্যা নিয়ে ভাবছি।'

বজলু বলল, 'গৌরীপুর থাইক্যা ডাক্তার সাহেব আসছেন। আপনেরে দেখতে চান।'

'এখন দেখা হবে না।'

'আপনার মাথাধরার বিষয়ে কথা বলতে চান।'

'এখন কথাও বলতে পারব না। আমি ব্যস্ত। অসম্ভব ব্যস্ত।'

বজলু মানুষটার মধ্যে ব্যস্ততার কিছু দেখল না। কাত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। হাতে একটা খাতা। এর নাম ব্যস্ততা? বজলু মাথা চুলকে বলল, 'রাতে কী খাবেন স্যার?'

'চা খাব।'

'ভাত-তরকারির কথা বলতে ছিলাম। হাঁস খাইবেন স্যার? অবশ্য বর্ষাকালে হাঁসের মাংসে কোনো টেস্ট থাকে না। হাঁস খেতে হয় শীতকালে। নতুন ধান উঠার পরে। নতুন ধান খাওয়ার কারণে হাঁসের শরীরে হয় চর্বি----'

'তুমি এখন যাও বজলু।'

মিসির আলি খাতা খুললেন।

আমার স্বামী এম· এস· ডিগ্রী করার জন্যে আজ সকালে টেক্সাস চলে গেলেন। টীচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ নিয়ে গেলেন। যাবার টিকিট আমি করে দিলাম। তিনি বললেন, 'আমি ছ' মাসের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি পাসপোর্ট করে রাখ।'

আমি বললাম, 'আমাকে নিতে হবে না। আমি ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাব না।'

'ঢাকা ছেড়ে যাওয়াই তোমার উচিত।'

'কোনটা আমার উচিত, কোনটা উচিত নয় তা আমি বুঝব।'

'তোমার হাজব্যান্ড হিসেবে আমারও বোঝা উচিত।'

'অনেক বুঝেছ, আর না।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ স্পষ্ট করে বল.

'যা বলতে চেয়েছি স্পষ্ট করেই বলেছি।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে বাস করতে চাও না?'

আমি একটু সময় নিলাম। খুব বেশি না, কয়েক সেকেন্ড। এই কয়েক

সেকেন্ডকেই মনে হল অনন্তকাল। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললাম, 'না।'

'কি বললে?'

'বললাম, না।'

'ও, আচ্ছা।'

আমার স্বামী–ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাঁর মুখে বিস্ময়ের ভাব ধরে রাখলো। তারপর আবার বললো, 'ও আচ্ছা।'

আমি বললাম, 'আমি যে তোমার সঙ্গে বাস করতে চাচ্ছি না, তা কি তুমি বুঝতে পার নি?'

'না, পারি নি।'

আমি হাসলাম। তিনি বললো, 'তোমার টাকাটা আমি পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব। দেরি করব না।'

'দেরি করলেও অসুবিধা নেই। না–পাঠালেও ক্ষতি নেই। আমার যা আছে তা আমার জন্যে যথেষ্ট।'

'তুমি কি আবার বিয়ে করবে?'

'জানি না, করতেও পারি। করার সম্ভাবনাই বেশি।'

'যদি বিয়ে করবে বলে ঠিক কর—তাহলে অবশ্যই সেই ভদ্রলোককে আগেভাগে জানিয়ে দিও যে তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি অসুস্থ একজন মানুষ।'

'আমি জানাব।'

উনি চলে যাবার পর আমি পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম। নিজেকে ব্যস্ত রাখার অনেক চেষ্টা করলাম। পুরনো বন্ধুদের খুঁজে বের করে আড্ডা দিই। মহিলা সমিতিতে নাটক দেখি, বই পড়ি, রাতে কড়া ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমুতে যাই।

এক রাতের কথা, বিশ মিলিগ্রাম ''ইউনেকট্রিন'' খেয়ে ঘুমিয়েছি। ঘুমের মধ্যেই মনে হল আমার ছেলেটা আমার পাশে শুয়ে আছে। তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। সেই অদ্ভুত গন্ধ, যা শুধু শিশুদের গায়েই থাকে। একেকজনের গায়ে একক রকম গন্ধ, যা শুধু মায়েরাই আলাদা করতে পারেন। আমি ছেলের মাথায় হাত রাখলাম। মাথাভর্তি চুল। রেশমের মতো নরম কোঁকড়ানো চুল।

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কোথাও কেউ নেই, থাকার কথাও নয়। স্বপ্ন তো স্বপ্নই। কিন্তু সেই স্বপ্ন এত স্পষ্ট। সত্যের এত কাছাকাছি? তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঠাণ্ডা পানির জন্যে খাবার ঘরে গিয়েছি, ফ্রীজের দরজায় হাত রেখেছি—আর ঠিক তখন শুনলাম আমার ছেলে আমাকে ডাকছে—'মা, মা।'

এতদিন শুধু কান্নার শব্দ শুনেছি। আজ প্রথম তাকে কিছু বলতে শুনলাম। আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেল। মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা–কাঁপা গলায় ডাকলাম, 'ও খোকা। খোকা! তুই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?'

কী আশ্চর্য কাণ্ড, আমার ছেলে জবাব দিল! স্পষ্ট বলল, 'হুঁ'।

'তুই কোথায় খোকা?'

'উঁ।'
'খোকা তুই কোথায়?'
'উঁ।'
'তুই কোথায়? আরেক বার আমাকে ডাক তো! আর মাত্র একবার।'
আমার ছেলে আমাকে ডাকল–'মা, মা।'
আমি সহ্য করতে পারলাম না। অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম।
আমি জানি এর সবটাই মায়া। একধরনের বিভ্রম। আমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। দুঃখে–কষ্টে–যন্ত্রণায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেবে। একটা নির্জন ঘরে আটকা থাকব। নিজের মনে হাসব, কাঁদব। গায়ের কাপড়ের কোনো ঠিক থাকবে না। অ্যাটেনডেন্টদের কেউ–কেউ আমার গায়ে হাত দিয়ে আনন্দ পাবে। আমার কিছুই করার থাকবে না।

এই সময় আমার এক বান্ধবী রেনুকা বলল, 'বুড়ি, তুই ছবি করবি? আমার মামা ছবি বানাচ্ছেন। অল্পবয়সী সুন্দরী নায়িকা খুঁজছেন। তোকে দেখলে হাতে আকাশের চাঁদ পাবেন। তুই এত সুন্দর!'

আমি বললাম, 'তোর ধারণা আমি সুন্দর?'

সে বলল, 'পৃথিবীর চারজন রূপবতীর মধ্যে তুই একজন। সেই চারজনের নাম শুনবি? তুই, তারপর হেলেন অব ট্রয়, কুইন অব সেবা, ক্লিওপেট্রা। তুই রাজি থাকলে মামাকে বলে দেখি।'

'আমি তো অভিনয় জানি না।'

'বাংলাদেশি ছবিতে অভিনয় করার প্রথম এবং একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে অভিনয় না–জানা। তুই অভিনয় জানিস না শুনলে মামা আনন্দে লাফাতে থাকবে। করবি অভিনয়?'

'করব।'

'চল, এখনই তোকে মামার কাছে নিয়ে যাই।'

প্রথম ছবি হিট করল। দ্বিতীয় ছবি হিট করল। তৃতীয়টা হল সুপার হিট। ছবি করা তো কিছু না—নিজেকে ব্যস্ত রাখা। ডাবল শিফট কাজ করি, অমানুষিক পরিশ্রম। রাতে ঘুমের অষুধ খেয়ে মড়ার মতো ঘুমাই। অনেক দিন ছেলের কান্না শুনি না। কথা শুনি না, মনে হল আমার মনের অসুখটা কেটে গেছে। এতে আনন্দিত হবার কথা। তা হই না। আমার ছেলের গলা শোনার জন্যে তৃষিত হয়ে থাকি। তারপর একদিন তার কথা শুনলাম।

'জায়া জননী' ছবির ডাবিং হচ্ছে। পর্দায় ঠোঁট নাড়া দেখে ভয়েস দেওয়া। একটা বাক্য কিছুতেই মেলাতে পারছি না। ক্লোজআপে ধরা আছে বলে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ঠোঁট মেলানোর চেষ্টা করতে–করতে মহা বিরক্ত বোধ করছি। ডিরেক্টর বললেন, 'কিছুক্ষণ রেস্ট নাও রূপা, চা খাও। দশ মিনিট টী ব্রেক।'

আমি আমার ঘরে চলে এলাম। নায়িকাদের জন্যে আলাদা একটা ঘর থাকে। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। আমি একা–একা চা খাচ্ছি। হঠাৎ আমার ছেলের গলা শুনলাম। প্রায় দু' বছর পর শুনছি, কিন্তু এত স্পষ্ট! এত তীব্র! আমার শরীর ঝনঝন করে উঠল।

'মা, ও মা।'
'কি খোকা?'
'তুমি কী কর?'
'চা খাচ্ছি।'
'তুমি কোথায়?'
'তুই কোথায় খোকা? তুই কোথায়?'
'এইখানে।'
'কী করছিস?'
'খেলছি।'
'ও খোকা। খোকা।'
'কি?'
'খোকা। খোকা।'
'উঁ।'
'কাছে আয়।'

আমার ছেলে কাঁদতে শুরু করল। তারপর সব আবার চুপচাপ হয়ে গেল। আমি ঘর থেকে বের হয়ে ডিরেক্টরকে বললাম, 'আজ আর কাজ করব না। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন, আমার ভয়ংকর খারাপ লাগছে।'

সেই রাতে আমি একগাদা ঘুমের অষুধ খেলাম। মরবার জন্যেই খেলাম। ডাক্তাররা আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করে ডাকলেন, 'বজলু।'

বজলু ছুটে এল। মিসির আলি বললেন, 'আমার ঢাকা যাওয়া দরকার। এখন যদি রওনা দিই তাহলে কতক্ষণে ঢাকা পৌঁছব!'

বজলু হতভম্ব হয়ে বলল, 'এখন কী যাইবেন? রাত দশটা বাজে।'

'গৌরীপুর থেকে ঢাকা যাবার কোনো ট্রেন কি নেই? যে-ট্রেন শেষরাতে ছাড়ে? চল, রওনা দিয়ে দিই।'

'স্যার, আপনের মাথাটা খারাপ।'

'কিছুটা খারাপ তো বটেই। জ্যোৎস্না রাত আছে। জ্যোৎস্না দেখতে-দেখতে যাব।'

'সত্যি যাইবেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি যাব। একটি দুঃখী মেয়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার। খুব দরকার।'

## ৮

রূপা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, 'এমন করে তাকাচ্ছ কেন? চিনতে পারছ না?'

'পারছি।'

'তোমার খাতা ফেরত দিতে এসেছি। সবটা পড়ি নি। অর্ধেকের মতো পড়েছি।'

'সবটা পড়েন নি কেন?'

'সবটা পড়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। আমার যা জানার তা জেনেছি। তুমি শান্ত হয়ে আমার সামনে বস। আমার যা বলার বলব। আমি যখন কথা বলব তখন আমাকে থামাবে না। চুপ করে শুনে যাবে।'

রূপা কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তোমার খাতা পড়ে প্রথম যে-ব্যাপারটায় আমার খটকা লেগেছে তা হচ্ছে তোমার ছেলের কবর গোরস্তানে কেন হল না? কেন তোমার বাড়িতে হল? তোমার মা এই কাজটি কেন করলেন? যে-মহিলা স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন রাখেন না, সেই মহিলা তাঁর নাতির স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার চেষ্টা কেন করবেন? রহস্যটা কী?

দ্বিতীয় খটকা—তোমার মা ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি তোমার ছেলের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কখনো দোয়া-দরুদ পড়েন না। এর মানে কী? এটা কি তাহলে কবর না? মেয়ে ভোলানোর চেষ্টা?...

'গোরস্তানে কবর দিতে হলে ডেথ সার্টিফিকেট লাগে। তাঁর কাছে ডেথ সার্টিফিকেট ছিল না। কারণ বাচ্চাটি মরে নি। তুমি তোমার মৃত শিশু দেখ নি।...

'ব্যাপারটা কি এ-রকম হতে পারে না? তোমার মা দেখলেন—তোমাদের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে হলে বাচ্চাটিকে মৃত ঘোষণা করাই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি? বাচ্চাটি দূরে সরিয়ে দিতে তাঁর খারাপ লাগল না, কারণ তিনিও খুব সম্ভব তোমার স্বামীর মতোই বিশ্বাস করেছেন—এই শিশুর বাবা তোমার স্বামী নন। তোমার মা মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মহিলা। তাঁর পক্ষে এ-রকম মনে করাই স্বাভাবিক।...

'এখন আসছি তুমি যে শিশুর কথা শুনতে পাচ্ছ সে-ব্যাপারটিতে। শিশুর সঙ্গে মায়ের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। তুমি তারিখ দিয়ে-দিয়ে সব লিখেছ বলে আমার খুব সুবিধা হয়েছে। আমি লক্ষ করলাম শুরুতে তুমি শুধু কান্না শুনতে।

'প্রথম যখন মা-মা ডাক শুনলে, হিসেব করে দেখলাম শিশুটির বয়স তখন এক বছর। এক বছর বয়সী শিশুরা মা ডাকতে শেখে। . . . .

'তোমার লেখা থেকে তারিখ দেখে হিসেব করে বের করলাম, তোমার ছেলে পুরো বাক্য যখন বলছে তখন তার বয়স তিন।

সত্যি যে তোমার সঙ্গে তোমার ছেলের একধরনের যোগাযোগ হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা প্যারানরম্যাল সাইকোলজির বিষয়। এবং রহস্যময় জগতের অসাধারণ একটি উদাহরণ। --

'আমার ধারণা, একটু চেষ্টা করলেই তুমি তোমার ছেলেকে খুঁজে পাবে। এত বড় একটা কাজ তোমার মা একা করতে পারেন না। তাঁকে কারো-না-কারোর সাহায্য নিতে হয়েছে। তোমাদের বাড়ির দারোয়ান, কাজের মেয়ে—এদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পার। পুলিশকে খবর দিতে পার। বাংলাদেশের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তার পরেও যদি কাজ না হয় তুমি তোমার

টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা ব্যবহার কর। ছেলের কাছ থেকেই জেনে নাও সে কোথায় আছে।'

রূপা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে?'

রূপা না-সূচক মাথা নাড়ল।

মিসির আলি বললেন, 'আজ উঠি। ধাক্কা সামলাতে তোমার সময় লাগবে। সাহস হারিও না। মন শক্ত রাখ। যাই।'

রূপা কোনো উত্তর দিল না, মূর্তির মতো বসে রইল।

এক মাস পরের কথা। মিসির আলির শরীর খুব খারাপ করেছে। তিনি তাঁর ঘরেই দিনরাত শুয়ে থাকেন। হোটেলের একটি ছেলে তাঁকে হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যায়, বেশির ভাগ দিন সেইসব খাবার মুখে দিতে পারেন না। প্রায় সময়ই অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করেন। এ-রকম সময়ে তিনি একটি চিঠি পেলেন। হাতের লেখা দেখেই চিনলেন—রূপার চিঠি। রূপা লিখেছে—

*শ্রদ্ধাস্পদেষু,*
*আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছি। সে এখন আমার সঙ্গেই আছে। আপনার সামনে আসার সাহস আমার নেই। আমি জানি আপনাকে দেখে চিৎকার করে কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করব। আপনাকে বিব্রত করব। আমি কোনোদিনই আপনার সামনে যাব না। শুধু একদিন আমার ছেলেটাকে পাঠাব। আপনি তার একটি নাম দিয়ে দেবেন এবং তার মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করবেন। আপনার পুণ্যস্পর্শে তার জীবন হবে মঙ্গলময়।*
*আমি শুনেছি আপনার শরীর ভালো না। কঠিন অসুখ বাঁধিয়েছেন। আপনি চিন্তা করবেন না। একজন দুঃখী মা'র হৃদয় আপনি আনন্দে পূর্ণ করেছেন। তার প্রতিদান আল্লাহ্‌কে দিতেই হবে। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার আয়ু কামনা করেছি। তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন।'*

মাথার তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও তিনি হাসলেন। মনে-মনে বললেন—বোকা মেয়ে, প্রকৃতি প্রার্থনার বশ নয়। প্রকৃতি প্রার্থনার বশ হলে পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে যেত। পৃথিবীর জন্যে প্রার্থনা তো কম করা হয় নি।

মিসির আলি টিয়া পাখির বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বসলেন। উড়ন্ত টিয়া পাখি কালো দেখায় কেন? কিছু-একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। মাথার তীব্র যন্ত্রণা ভুলে থাকার ছেলেমানুষি এক চেষ্টা।

---

More Books @ BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com